- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি
- রোহিঙ্গা সমস্যা
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য
- জনশক্তি রপ্তানি
- GSP
- তৈরি পোশাক শিল্প
- স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জন

Syllabus on Bangladesh Affairs

Foreign Policy and External Relations of Bangladesh

Goals, Determinanta and policy formulation process; Factors of National Power; Security Strategies; Geo-Politics and Environment Issues; Economic Diplomacy; Man-power exploitation, Participation in International Organizations; UNO and UN Peace Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, E-8 etc, and International Economic Institutions, Foreign Aid, International Trade.

BCS প্রশ্নাবলী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

- ইপিজেড (EPZ) কীভাবে বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? *(৪০তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (BEPZ) মধ্যে পার্থক্য কী? *(৪০তম বিসিএস)*
- পিপিপি (PPP)-এর আওতায় এ পর্যন্ত সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকল্পগুলো কী কী? *(৪০তম বিসিএস)*
- রোহিঙ্গা কারা? *(৩৮তম বিসিএস)*
- সাম্প্রতিককালে ব্যাপক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বাংলাদেশের জন্য যে সংকট সৃষ্টি করেছে তা আলোচনা করুন। *(৩৮তম বিসিএস)*
- এ সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাবার কোনো উপায় আছে কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের নিয়ামকসমূহ আলোচনা করুন। *(৩৭তম বিসিএস)*
- বর্তমান ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভবপর বলে আপনি মনে করেন, সে ধরনের সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরুন। *(৩৭তম বিসিএস)*

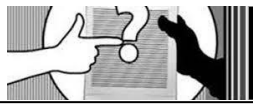

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২. 'জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নির্ধারক'-ব্যাখ্যা করুন।
৩. মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।
৪. সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গতিবিধি পর্যালোচনা করুন।
৫. বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের অর্জন আলোচনা করুন।
৬. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করুন।
৭. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনশক্তি রপ্তানির গুরুত্ব তুলে ধরুন। জনশক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।
৮. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর পোশাক শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিট্যান্স খাতের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
১০. অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

আলোচ্য বিষয়

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি
- রোহিঙ্গা সমস্যা

STUDENT STUDY

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হওয়ায় প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে লেগেছে নতুন হাওয়া। ইতোপূর্বে বিভিন্ন দেশে স্নায়ুযুদ্ধের কারণে জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক বিষয়াদি সবচেয়ে গুরুত্ব পেত এখন সেটার অবসান হয়েছে। সেখানে স্থান করে নিয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও নির্ধারিত হয়েছে মৌলিক অধিকার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতি হলো কোনো দেশের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বিশ্বে সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় নীতিরই অনিবার্য অনুষঙ্গ।

জার্মান রাষ্ট্রনায়ক অটোভন বিসমার্ক বলেন, 'কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো বৈদেশিক নীতি।' 'Prof. Padelford ও Lincoln তাঁদের 'Dynamics of International Politics' গ্রন্থে বলেন, 'বৈদেশিক নীতি হলো একটি দেশের জাতীয় নীতির একটি অংশ, যার দ্বারা অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্ক জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।' Joseph Frankle তাঁর 'Making of Foreign Policy' গ্রন্থে বলেছেন, 'বৈদেশিক নীতি হলো সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।' সুতরাং বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণাগুলোর আলোকে বলা যায়, কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় সেটাই তার বৈদেশিক নীতি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য

বিশ্বের সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সাধারণভাবে এক ও অভিন্ন। এ উদ্দেশ্যগুলো প্রধানত দেশসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার নিজস্ব অভিমত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন- এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। নিচে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা :** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং সমতা বজায় রাখা। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতের সাথে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ও তিনবিঘা করিডোর নিয়ে কূটনীতি এবং অবশেষে তার উল্লেখযোগ্য সমাধান এ উদ্দেশ্যকে আরো উজ্জ্বল করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শান্তিকামী দেশ হিসেবে সব দেশের সাথেই বন্ধুত্ব কামনা করে, কারো প্রভূত্ব স্বীকার করে না। যেসব দেশ অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে সেসব দেশকে বাংলাদেশ সমর্থন করে না কিংবা তার সাথে বন্ধুত্বও রাখে না।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুক্তি ব্যতিত কোনো দেশের ভূ-খণ্ডগত স্বাধীনতা অর্থহীন। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও এক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা অর্জন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, রুগ্ন শিল্প ও অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া মুক্ত অর্থনীতির যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিদেশি বাজার ধরা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ সব সময়ই নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (NIEO-New International Economic Order) সমর্থক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্লকে যোগদান ও Islamic Common Market গড়তে যেমন আন্তরিক, তেমনি ডি-৮, দক্ষিণ এশিয়ায় SAPTA ও SAFTA বাস্তবায়ন, উন্নয়ন চতুর্ভূজ ও উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনেও বদ্ধপরিকর।

৩. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা :** পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্লকের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখে। দেশের প্রথম ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখলেও পরবর্তী সরকারগুলো পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। এমনকি ধর্মীয় আদর্শকে সমুন্নত রাখতে আরব দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক সুনিবিড়। এক্ষেত্রে মতাদর্শগত পার্থক্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

৪. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা :** শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তার পরিবেশ সৃষ্টি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যাশা করে বলে সব সময়ই অস্ত্র প্রতিযোগিতা, জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষ ও জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে। এ কারণে বাংলাদেশ বসনিয়া ও কসোভোয় মুসলিম নিধনকে নিন্দা জানায়। আবার এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ, পঞ্চশীলানীতি ও বান্দুং ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। অন্যদিকে নিজস্ব নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো, বিশেষত প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এ কারণে উপমহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ অত্যন্ত সোচ্ছার ভূমিকা রেখেছে। কারণ এ অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক, বাংলাদেশ তা কোনোভাবেই চায় না।

৫. **জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখা :** বাংলাদেশের প্রধান পরিচয় হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। যে কোনো মূল্যে এ পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ একদিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, অন্যদিকে নিজস্ব স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া সর্বপ্রকার বর্ণবাদ, ইহুদিবাদ, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদ দূরীকরণ এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অপর একটি উদ্দেশ্য।

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ

যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও যোগাযোগের অংশ। তাই পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ বিভিন্ন উপাদান, অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই ফ্যাক্টরগুলোই পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ নিম্নোক্ত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত- ০১. অভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিত ও ০২. আন্তর্জাতিক বা বহির্বিশ্ব প্রেক্ষিত।

অভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিত

ক. **ইতিহাস ও সামাজিক ঐতিহ্যগত উপাদান :** কোন একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সভ্যতা, নৃতত্ত্ব, জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মতাদর্শ, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়। রাষ্ট্রের ইতিহাসের বিভিন্ন পূর্বে জাতির নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্বগণের আদর্শ, ভাবধারা, নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি ও বিকাশ, সাংস্কৃতিক স্বাদৃশ্য, ধর্মীয় ও চিরায়াত আচার অনুষ্ঠান পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য। এছাড়া ভাষা ও ধর্মের, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতি প্রভৃতি বিষয় পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচ্য। যেমন- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ধর্মীয় বিশ্বাসের মিলের উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি রচিত হয়েছে।

খ. **ভৌগোলিক অবস্থান :** বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দুটি বৃহৎ শক্তি চীন ও ভারতের প্রতিবেশি। বিশেষ করে ভারত এ দেশটিকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তাই ভারতকে উপেক্ষা করা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার। স্বভাবতই এ দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ভারত একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ও বাংলাদেশ পাকিস্তান ও চীনের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রাখে।

গ. **ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ:** ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত প্রতিবেশি দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ববাদের কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতঘেঁষা ও ভারতবিরোধী দুটি ধারাই উপস্থিত, যা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে একটি জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরটি পররাষ্ট্রনীতিতে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মিয়ানমারের সাথে যোগাযোগ থাকায় মিয়ানমারও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি নির্ধারক শক্তি।

ঘ. **ভূ-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত:** ভারত বিশাল দেশ। তার আছে বিশাল উৎপাদন ক্ষেত্র। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক আধিপত্য আমাদের কব্জা করে রেখেছে। অপরদিকে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর খুলে দিয়েছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যের স্বর্ণদুয়ার। এসব ভূ-অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ঘটায়।

ঙ. **রাজনৈতিক নেতৃত্ব :** একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শিক বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কারণে শেখ মুজিবের চেতনায় ভারতীয় প্রভাব ছিল। আওয়ামী লীগের একটি অংশ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। ফলে মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সোভিয়েত ব্লকের প্রতি ঝুঁকে ছিল। পরবর্তীতে মোশতাক ও জিয়াউর রহমান ইসলামী চেতনায় প্রভাবিত হয়ে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ঘটান।

চ. **জনমত :** গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে জনগণের চেতনার প্রতিফলন ঘটানো উচিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতেও ধর্মীয় প্রভাব এবং জনমতের প্রতিফলন বিদ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের পক্ষেও এ বিষয়টি উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে নির্ধারণে জনগণের মতামতও উপেক্ষিত নয়।

ছ. **চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী :** বাংলাদেশে বিরোধী দল, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, চেম্বার অব কমার্স, বেসরকারি সংস্থাসমূহ চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে এই গোষ্ঠীগুলোও নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কারণ এদের পছন্দ ও মতামত উপেক্ষা করে কোনো ক্রমেই সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ সম্ভব হয় না।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

ক. **বিশ্বরাজনীতির দৃশ্যপট :** স্নায়ুযুদ্ধের চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মার্কিন অক্ষশক্তি ও সোভিয়েত অক্ষশক্তির দ্বৈত কর্তৃত্বের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল সোভিয়েত-ভারত অক্ষশক্তির কূটনৈতিক বিজয় আর পাকিস্তানি চীন-মার্কিন শক্তির পরাজয়। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সূচনা ঘটে ভারত ও সোভিয়েতকে অনুসরণ করে। পরবর্তীতে অবশ্য আবার ঝুঁকে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।

খ. **ইসলামী বিশ্ব :** বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণে ইসলাম মৌলিক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ না করলেও এর একটা ভূমিকা রয়েছে। সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের ২ নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি সংরক্ষণ ও জোরদার করতে সচেষ্ট হবেন।' মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার করাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য।

গ. **আঞ্চলিক পরিবেশ :** বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলা সহজ নয়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমতা এবং আঞ্চলিক নৈকট্যের কারণে এদের মাঝে একটা সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির জন্য জিয়াউর রহমান প্রয়াস চালিয়েছিলেন, যার ফলে সার্ক গঠন করা হয়েছিল। তাই আঞ্চলিক পরিবেশ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

ঘ. **আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতিমালা :** কোন দেশ যে সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে তার পররাষ্ট্রনীতিতে সে সকল সংস্থার নীতি অনুসৃত হয় ও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ জাতিসংঘ, ওআইসি, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, সার্ক, বিম্‌সটেক প্রভৃতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ায় এ দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এ সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

ঙ. **বিশ্বব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশ্বের পরাক্রমশালী দেশগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। এই প্রভাব কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো রাজনৈতিক অথবা সামরিক কায়দায় বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও সময়ের সাথে কখনো প্রাচ্যমুখী, কখনো পাশ্চাত্যমুখী ধারায় আবর্তিত হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের বলা হয়েছে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এ সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এ সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-

ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে।

খ. প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে এবং

গ. সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

অবশ্য এ লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছিল বাংলাদেশ যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটান। এতে বলা হয়, রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্টা হবে।

➘ বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের বক্তব্য থেকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা পাওয়া যায় তা হলো-

০১. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।
০২. অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা।
০৩. জাতিসংঘের গৃহীত নীতিমালা মেনে চলা।
০৪. আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান।
০৫. কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
০৬. অন্যান্য দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।
০৭. বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা।
০৮. মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

প্রথমত, জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা ও অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ।

তৃতীয়ত, EU, ASEAN, OPEC, GCC, OIC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

চতুর্থত, বাংলাদেশ মুসলিম দেশসমূহের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা ও ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থক দেশ। বাংলাদেশ আল কুদস কমিটির সদস্য, ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তির অন্যতম সমর্থনকারী।

পঞ্চমত, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতিসহ সকল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সোচ্চার এবং বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক।

ষষ্ঠত, যে কোনো দেশে শক্তিপ্রয়োগ ও বিদ্বেষপ্রসূত কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি হামলা চালানোর ঘোর বিরোধী। তাই বসনিয়া ও কসোভোতে মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সপ্তমত, বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Dimplomacy) উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। এতে করে এতদাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন গতিসঞ্চার হয়েছে, তেমনি সাপটা ও সাফটা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ায় বাংলাদেশে বাণিজ্যের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার।

অষ্টমত, জোট নিরপেক্ষ নীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য এবং কোনো সামরিক জোট বা মতাদর্শের অনুসারী নয়। তৃতীয় বিশ্বের সংহতির প্রতিও বাংলাদেশের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে।

বিগত তিন দশকব্যাপী বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায়ও বাংলাদেশ একটি জোট নিরপেক্ষ, মুসলিমপ্রধান ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠনসহ পশ্চিমা শক্তি ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে, ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসন লাভ করে, ২০০০ সালে পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে এবং বহুকাল ধরে ৭৭ জাতি গ্রুপ সংস্থার (Group of- 77) নেতৃত্ব প্রদান করে।

➘ পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা

একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশসমূহের বিশ্বনীতির ভিত্তিই হলো 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে হলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেও সোচ্চার হতে হবে। রচনা করতে হবে একটি গতিশীল অর্থনীতি ও শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিমালা।

অধ্যাপক আবুল কালাম এ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের প্রতি অন্যান্য রাষ্ট্রের আচরণ দেখেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হওয়া উচিত এবং সেভাবেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতি হবে আন্ত:ক্রিয়াভিত্তিক অর্থাৎ ইতিবাচক ক্রিয়ার বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রত্যুত্তর হবে ইতিবাচক, পক্ষান্তরে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হবে নেতিবাচক। তাছাড়া স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে একক বিশ্বব্যবস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির মোকাবেলায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার নীতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এককভাবে কোনো রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতা' নীতিতে এগোতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে এবং বিশ্বে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পরিচিত হতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যাবলির আলোকে বলা যায়, নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অধিকার রক্ষা, জোট নিরপেক্ষতা, আঞ্চলিক অর্থনীতির সংহতিকরণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূখ্য উদ্দেশ্য। বৈদেশিক পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যাবলী বহুমুখী, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে একটি উন্নত জাতির মর্যাদা নিয়ে গৌরবের সাথে অবস্থান করতে চায়।

STUDENT STUDY বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব এবং ওআইসি-তে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কিরূপ হবে তা সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫(২) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম দিক তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবেন।" এজন্য ফিলিস্তিনিসহ বিশ্বের বিভিন্ন নির্যাতিত মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুসম্পর্কে বজায় রাখতে সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক কারণেও মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

'মুসলিম' বিশ্ব বলতে কি বুঝায় তা সংজ্ঞায়িত করে বলা কঠিন। মাওসেতুং-এর প্রচারিত 'তৃতীয় দুনিয়া তত্ত্ব' সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করার পর সম্ভবত মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে নিয়ে মুসলিম বিশ্ব গঠন অথবা নামকরণের জন্য কিছু কিছু চিন্তাবিদ চেষ্টা করেন। তারপর থেকেই মুসলিম প্রধান দেশসমূহের সমষ্টিকে 'মুসলিম বিশ্ব' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যদি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত তথা পাশ্বাত্য দেশগুলোকে 'প্রথম বিশ্ব' বা 'উন্নত বিশ্ব', পুর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোটভুক্ত দেশসমূহকে 'দ্বিতীয় বিশ্ব' এবং এ দু' ধরনের জোটের বহির্ভূত শতকরা আশি ভাগ জনভার জর্জরিত দেশসমূহের সমষ্টিকে তথা উন্নয়নশীল বা গরীব দেশগুলোর সমষ্টিকে 'তৃতীয় বিশ্ব' বা 'তৃতীয় দুনিয়া' বলা হয়ে থাকে; তবে বেশির ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী- অধ্যুষিত দেশসমূহের সমষ্টিকেও 'মুসলিম বিশ্ব' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

➘ মুসলিম বিশ্ব প্রেক্ষিতে নির্ধারক

- **প্রথমত :** তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর জনশক্তির প্রয়োজন অথচ পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি এদের নেই। কাজেই বেকার সমস্যায় পীড়িত বাংলাদেশ শ্রমশক্তি রপ্তানি করতে পারলে দেশের জন্য ভাল। প্রকৃত অর্থে এই ধারণা পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে প্রচুর শ্রমশক্তির রপ্তানি করতে সক্ষম হয়।
- **দ্বিতীয়ত :** ইরাক, লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য আরব সমস্যার প্রতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নৈতিক সমর্থন মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যাবশ্যক।

➘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নির্ধারক

- **প্রথমত :** বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে পেট্রো-ডলার ঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে বাংলাদেশ সরকার মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য তৎপর হয়।
- **দ্বিতীয়ত :** অপরিশোধিত তৈল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল।

  কাজেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও বাংলাদেশের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট করণ ও বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।

↘ মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রাসমূহ

- **প্রথম পর্যায় : মুজিব আমল-১৯৭২-৭৫ : প্রাথমিক পদক্ষেপ ও সম্পর্কের সূচনা-**

  মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে যা মুক্ত বাংলাদেশেও অব্যাহত রাখে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করায় মুসলিম বিশ্বের সাথে তার ব্যবধান বেড়ে যায়। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম সূচনা হয় ১৯৭২ সালে আফ্রো-এশিয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে। এ সম্মেলনে সমবেত আরব রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত NAM শীর্ষ সম্মেলনে মুজিবের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। এই সময় সৌদি বাদশাহর সাথে বৈঠকের পর সৌদি সহকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা অনেক পরিস্কার। ১৯৭৩ সালে ৪র্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের পক্ষ অমলম্বন করে। ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং OIC-এর সদস্যপদ লাভ মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষ করে পাকিস্তানের স্বীকৃতি মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপনের দুয়ার খুলে দেয়। এভাবে মুজিব আমলে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

- **দ্বিতীয় পর্যায় : জিয়া আমল- ১৯৭৫-৮১ : ইসলামী বিশ্বের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কূটনীতি-**

  জিয়াউর রহমান পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। তিনি সাংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ বিশেষ করে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা তুলে দিয়ে দেশে ধর্মীয় রাজনীতির প্রচলন করেন। একই সাথে সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের সাথে ২৫(২) যুক্ত করে মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের যুক্ত ইস্তেহারে বাংলাদেশের ফারাক্কা সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এই প্রথমবারের মত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশেষ একটি সমস্যা বিবেচিত হয়। সম্মেলন শেষে দেশে ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট জিয়া সৌদি আরব ও ইরান সফর করেন। এই সফরের দুটো ইতিবাচক ফল হয়েছিল।

  - **প্রথমত :** সৌদি আরব ও ইরান উভয়ে ফারাক্কা ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
  - **দ্বিতীয়ত :** বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের জন্য অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দেয়। ১৯৭৯ সালে দশম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রস্তাব করে যে, পুঁজি ও মানব সম্পদের পারস্পরিক বিনিময় করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হবে। একটি অভিন্ন ইসলামী বাজার গঠনেরও প্রস্তাব দেয়া হয়। এই সময়ে বাংলাদেশ আফগান সমস্যার প্রতি যেভাবে অবস্থান নেয় তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাগভাজন হতে হয়।

- **তৃতীয় পর্যায় : এরশাদ আমল-**

  মার্চ ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করে এরশাদ তার সরকারের বৈরীতার ভিত্তি সৃষ্টি করতে ইসলামী সংহতি ও ইসলামী বিধি বিধান রচনার উপর গুরুত্ব দেন। প্রকৃত অর্থে তিনি জিয়া প্রবর্তিত নীতি অব্যাহত রাখেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ধিত করেন। যেমন ফিলিস্তিন সমস্যা, আফগান সমস্যার ব্যাপারে জিয়ার নীতি অপরিবর্তিত থাকে। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করে ইসলামী বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হয়। ১৯৮৩ সালের ৬-১০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। বাংলাদেশে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ছিল প্রথম, সে কারণে বাংলাদেশের জন্য এ সম্মেলন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ যেমন বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

- **চতুর্থ পর্যায় : খালেদা-হাসিনা আমল (১৯৯১-২০০৬)**

১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ-মুসলিম বিশ্ব সম্পর্ক মূলত: পূর্ববর্তী সম্পর্কেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হলে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সফরে সৌদি আরব গমন করেন। যদিও এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র ওমরাহ পালন। তথাপি সৌদি বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সৌদি বাদশা বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন এ যাত্রায় আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আছি। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল তার জাতীয় স্বার্থ সমৃদ্ধি করা।

বাস্তবে বাংলাদেশ এ কারণেই মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যেহেতু পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য সময় এবং বেশ কিছু মুসলিম দেশ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতেও সচেষ্ট, তাই বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ককে বাস্তবতার আলোকেই দেখা উচিত, বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়। বিগত জোট সরকারও মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র সফর করেন। ও.আই.সি-র নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মহাসচিব নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালায়। ইরাক যুদ্ধে মার্কিন চাপে সরাসরি বিরোধিতা না করলেও নিজেদের সতর্কতার সাথে গুটিয়ে রাখে। যুদ্ধোত্তর ইরাকে বাংলাদেশের সৈন্য প্রেরণ বিষয়ে মার্কিন চাপকেও কৌশলে এড়িয়ে যায়। পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগসহ বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে শুল্কমুক্ত বাজার পাবার জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যায়।

- **পঞ্চম পর্যায় : ড: ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল (২০০৭-০৮)**
  ২০০৬ সনে খালেদা জিয়া সরকারের দ্বিতীয়বারের মত মেয়াদ শেষ হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এবারই প্রথম বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের অতিরিক্ত সময় ক্ষমতাসীন থাকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্রনীতি গুরুত্ব পায়। পঞ্চম তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পূর্বের মত মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে নতুন চুক্তিসমূহ মুসলিম বিশ্বের সাথে অব্যাহত সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।

- **ষষ্ঠ পর্যায় : মহাজোট সরকারের আমল (২০০৯-বর্তমান)**
  মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম দাতা দেশ। এছাড়া বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রায় ৭০ ভাগ শ্রমিক মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার তাই মুসলিম বিশ্বের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা ও সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর বদ্ধ পরিকর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে সৌদি আরব সফর করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

ওআইসি ও বাংলাদেশ

ওআইসি-তে বাংলাদেশের অবদান এবং বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক- দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জন্মলগ্নে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সাথে তেমন সম্পৃক্ত না থাকলেও পরবর্তীকালে ওআইসি'র সাথে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ বর্তমান ওআইসি'র বিভিন্ন অংগ সংগঠনে শুধু সক্রিয় ভূমিকাই পালন করে না; বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে অত্যন্ত আস্থাভাজন সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে পাঁচ বছর মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের কার্যত সম্পর্ক ছিল না। ১৯৭৬ সালের আগে বাংলাদেশে কোন মুসলিম দেশের দূতাবাস স্থাপিত হয়নি। ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেছিলেন। যদিও পাকিস্তান বাংলাদেশকে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি; তবুও বাংলাদেশ উক্ত সম্মেলনে পনের বছর বয়স্ক সংগঠন ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত হয়। ওআইসি সদস্যভুক্ত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনে সদস্য, চেয়ারম্যান কিংবা সচিব হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে; যা বাংলাদেশের প্রতি ওআইসিভুক্ত অন্যান্য দেশের আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

- বাংলাদেশ ওআইসি'র নিম্নলিখিত অঙ্গ সংগঠনসমূহের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে :
  - মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসন এর নেতৃত্বাধীন পনের সদস্য বিশিষ্ট আল কুদস কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন;
  - তিন সদস্য বিশিষ্ট শীর্ষ কমিটির সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন; যা মরক্কোর বাদশাহর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল;
  - সেনেগালের প্রেসিডেন্ট-এর নেতৃত্বে তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক তের সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন;
  - তের সদস্য বিশিষ্ট ইসলামিক সলিডারিটি ফাণ্ডের স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন;
  - ইরান-ইরাকের মধ্যকার বিরোধ মেটানোর জন্য নয় সদস্য বিশিষ্ট শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে উদ্যোগী হয়ে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উক্ত দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

ওআইসি'র প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আহমেদ করিম, ১৯৭৭ সনের জুলাই মাসে ঢাকা সফরে এসে বলেছিলেন যে, ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ওআইসি মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের

পূর্বে সেনেগালের ররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলাদেশের সাথে তার দেশের সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলোর জন্য ইসলামিক বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে যৌথ শিপিং লাইন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়, যাতে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন গড়ে ওঠে। ১৯৮৩ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ 'ইসলামিক কাউন্সিল ফর সিভিল এভিয়েশন' নামক অংগ সংগঠনের সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ প্যালেস্টাইনের জন্য আট সদস্য বিশিষ্ট সম্মেলনের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন, যা সপ্তম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে গঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য পিএলও'র প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের নিকট থেকে তিনি এ মর্মে বিশেষ আহ্বান পেয়েছিলেন।

বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ বয়ে নিয়ে এসেছে। কেননা মার্কিন আধিপত্য যে বিশাল আকার নিচ্ছে তাতে বাংলাদেশের ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নতুন প্রেক্ষাপট দিয়ে চিন্তা করতে হবে। গ্যাস রপ্তানি ইস্যুতে বিরোধ থেকে যদি দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয়ে অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি তা হলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে দেশের মাটির নিচে অবস্থিত সম্পদের ব্যবহার নিয়ে জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। সুতরাং রপ্তানি বহুমুখীকরণের কৌশলের সঙ্গে পোশাক শিল্পের নতুন ও সহজ শর্তের বাজার খোঁজার মাধ্যমে এ জাতীয় চাপকে কাটানো যায় কিনা ভাবতে হবে। তাই বাংলাদেশের উচিত মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে।

STUDENT STUDY বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিদ্যমান বিবাদমান ইস্যু সমূহ

অথবা, **সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিস্তারিত;**
অথবা, **বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিবিধি।**

এশিয়া মহাদেশের একটি অংশে চীন ও ভারত ক্ষমতাশালী দেশ হিসেবে পরিচিত। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব না থাকায় বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার উন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। মিয়ানমারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। মিয়ানমার চীনের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং চীন মিয়ানমারকে বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক যে মধুর এই উক্তি করা সম্ভব হবে না।

প্রতিবেশি দেশগুলোর ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন : প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলো ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার দিকে তাকালে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ঐক্য রাষ্ট্রগুলোকে যে অভিন্ন সম্পর্কে বাঁধতে পারে না মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালে তা যেমন স্পষ্ট হয়, ভারত ও নেপালের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও এই সত্য প্রতিভাত হয়। ভারত ও নেপালের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুত্বের সম্পর্কে থাকলেও এই দু দেশের যেভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, সেই বন্ধন বর্তমানে অনেকাংশেই অস্থিতিশীল পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত যেভাবে নেপালের ওপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক নেপালের জনসাধারণ সেই বন্ধন মান্য করতে আগ্রহী নয় বলে দু দেশের অতীত সম্পর্কের মধ্যে বর্তমানে ফাটল ধরেছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ১৯৭১ সালের পর যে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল পরবর্তীকালে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কারণ, সার্বিকভাবে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ। যে দেশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য জীবন বিসর্জন দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে সে দেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়, কিন্তু সার্বিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নয়। বাংলাদেশ চেয়েছিল স্বাধীনতার পর একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে নিজেদের গঠন করে পৃথিবীর বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে। এই কারণে ক্রমশ ভারতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে পথ পরিক্রম করার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। তার কারণ, বাংলাদেশ ও ভারত শুধু পাশাপাশি অবস্থিত নয়, দু দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি আন্তঃবিনিময়ের ক্ষেত্রেও নির্ভরশীল। বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে।

➘ **বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিবাদমান বিষয়সমূহ :** বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে প্রচুর মতপার্থক্য থাকলেও এক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলো বর্তমানে দু দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকম সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন-

ক. **পানি বণ্টন সমস্যা :** স্বাধীনতা লাভের পরই বাংলাদেশ প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো পানি বণ্টন সমস্যা। বাংলাদেশের সব নদীর প্রবাহই ভারতের ভেতর দিয়ে এসেছে বলে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতের ওপর বাংলাদেশ নির্ভরশীল। ভারত ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন নদীর প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বাংলাদেশের জন্য নদীর পানি কৃষিকাজ, শিল্প-কারখানা, নদীপথে যাতায়াত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই নদীরও মূল পথ নেপালে বলে যখন পানি সমস্যার দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছিল তখন বাংলাদেশ শুধু ভারতকে নিয়ে নয়, নেপালকে নিয়েও তিন দেশের সমন্বয়ে যৌথ নদী কমিশনের প্রস্তাব দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পদ্মার প্রবাহ স্থবির হয়ে পড়ে। অথচ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশের মধ্য দিয়ে নদী অন্য দেশে প্রবাহিত হলে তার নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ নয়। ভারত এই নিয়ম মান্য করে প্রতিবেশি বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়নি। যে ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে এত বিতর্ক, বর্তমানে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সম্প্রতি ভারত তার অভ্যন্তরস্থ নদীগুলোর প্রবাহ খাল কেটে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার পর বাংলাদেশ আরো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত প্রতিবাদ ভারতের মন:পুত হয়নি। ভারতের প্রস্তাবিত নদী আন্ত:সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য ভয়ানক এক দু:সংবাদ। ভারত এই প্রকল্পে অগ্রসর হলে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে মণিপুর রাজ্যে ভারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

খ. **গ্যাস রপ্তানি বিতর্ক :** নদীর পানি সমস্যার পর বাংলাদেশকে দ্বিতীয় একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সমস্যা হলো গ্যাস রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যা। কিন্তু বাংলাদেশে যে পরিমাণ গ্যাস রক্ষিত আছে তা বহির্বাণিজ্যের জন্য কোনো অংশেই অনুকূল নয়। অথচ গ্যাস রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল এক পর্যায়ে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সব সময় চায় ছোট দেশগুলো দরিদ্র থেকে তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকুক। তাহলে ছোট দেশগুলোকে নিয়ে পুতুলের মতো খেলা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ভারতে তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মত না হলে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ফান্ড যে কোনো সময়ে তাদের ঋণ বন্ধ করে দিতে পারে। আমেরিকা তার দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার নর-নারীর জীবনে বেকারত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রদূত যখন ঢাকায় এসে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে ওকালতি করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমেরিকা কিভাবে অন্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শুধু হস্তক্ষেপ নয়, নিয়ন্ত্রণ করতেও ইচ্ছুক। বাংলাদেশ ভারতের মতো বড় দেশ হলে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এ মন্তব্য করতে পারতেন না। একটি গরিদ দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে যে কতখানি বিপন্ন বাংলাদেশের অবস্থা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ. **মুক্তবাণিজ্য চুক্তি :** বাংলাদেশ তৃতীয় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে যখন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে কিছু ভালো কাজের মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এই সমস্যাটি হলো ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও শিল্পোন্নয়নের দিকটি গভীরভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

তার কারণ, মুক্ত বাণিজ্য সমশ্রেণির দুটি দেশের মধ্যে প্রচলন যত সুবিধাজনক, অসম দুটি দেশের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা আশা করা কঠিন। ভারত শিল্পোন্নত দেশ বলে সেখানে যে পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত হয়, বাংলাদেশ তা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে যে অতিরিক্ত ও গুণসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে তা দেশের বাইরে কয়েকটি দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে তা দেশের চাহিদা মেটাতে প্রায় সক্ষম। ভারতকে বাংলাদেশে মুক্তভাবে পণ্যের প্রবেশাধিকার দিলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকবে এবং তার ফলে শিল্প কারখানার যে ক্ষতি হবে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে কারখানায় কর্মরত কর্মচারীদের ওপর।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন থেকে ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের অধিকার চাইলেও ভারতের পক্ষ থেকে তা স্বীকৃত হয়নি। এক্ষেত্রে মুক্তবাজার সৃষ্টির পর বাংলাদেশের পণ্য ভারতে কিভাবে প্রবেশ করবে সে দিকও বিবেচনার প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মুক্তবাজার সৃষ্টির অর্থ দেশের শিল্পকে বিপন্ন করা। দেশ শুধু গুটিকতক ব্যবসায়ীর নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণেরও। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা চিন্তা করেই মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে ভাবা প্রয়োজন।

ঘ. **ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট :** বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় ছোট দেশ হলেও ভৌগোলিক বিবেচনায় ভারত বাংলাদেশের নিকট একটি ক্ষেত্রে আটক রয়েছে। ভারতের যে পূর্বাঞ্চলীয় ৭ টি রাজ্য রয়েছে এগুলো বাংলাদেশের ভূমি দ্বারা মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সাতটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল। এ রাজ্যগুলোতে একদিকে প্রচুর

প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এ সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যেমন করা যাচ্ছে না তেমনি এ সকল অঞ্চলের যথাযথ উন্নয়নও সাধিত হচ্ছে না। তাছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদী দমন, অভ্যন্তরীণ সহজতর এবং দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ সাতটি রাজ্য বা সেভেন সিস্টারসে যাওয়ার একটি ট্রানজিট দাবি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অন্যদিকে বাংলাদেশও তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াসহ নানাবিধ আশঙ্কায় এ জাতীয় ভারতীয় দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিতে পারছে না। ফলে যখনই ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রশ্ন এসেছে ভারত তখনই এ বিষয়টিকে আলোচনার মূল এজেন্ডায় এনে দর কষাকষির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে এ বিষয়টিতে বাংলাদেশ ছাড় না দেওয়ায় ভারত বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার নানা ফন্দি আঁটতে কখনোই ভুল করেনি।

ঙ. **বাংলাদেশ সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের ঘাঁটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য :** ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গিগোষ্ঠী ও আইএসআই-এর ঘাঁটি রয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের সে অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করে এ বিষয়ে যথাযথ প্রমাণাদি উপস্থাপনের আহ্বান জানিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে ২০০১ সালের ৭ নভেম্বর হারিয়ানায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া পুলিশ'-এর অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানি বাংলাদেশে আল কায়েদা ও আইএসআই-এর ঘাঁটি রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এমনকি ভারতের মুম্বাইতে যে ভয়াবহ বোমা হামলা হয় তাতেও বাংলাদেশকে জড়ানোর চেষ্টা চালায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এ জাতীয় তৎপরতা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায়ই টানাপড়েন সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দু দেশের মধ্যে সন্ত্রাসী তালিকা বিনিময় হয়।

চ. **পুশইন ও পুশব্যাক :** ভারতের আধিপত্য নীতি, সীমান্তে বিডিআর ও বাঙ্গালি হত্যা এবং পুশইনের ঘটনা নতুন নয়। ভারত অভিযোগ করে যে, সেখানে ২ কোটির মতো অবৈধ বাংলাদেশি রয়েছে। বলা হয়, ঐ সব বাংলাদেশি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রায়ই ভারত বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাবার চেষ্টা করে।

ছ. **সমুদ্রসীমা বিরোধ :** ১৪ মার্চ ২০১২ মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির পর ৭ জুলাই ২০১৪ নিষ্পত্তি হয় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ। এ বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বাংলাদেশ এক বিপুল অঞ্চলে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার আর ভারত পাবে ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ রায়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নিটক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বহুল আলোচিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ এলাকাটি এ রায়ের ফলে ভারতের মধ্যে পড়েছে।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে কয়টি বিবাদমান ইস্যু রয়েছে সেগুলো খুবই জটিল। এ বিষয়গুলোর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা এমনকি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিশেষ করে নদীর পানি বণ্টন, গ্যাস রপ্তানিসহ মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের মতো বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারত যে সর্বনাশা খেলায় মেতেছে সেক্ষেত্রে ভারতের মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা ও আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত করার জোরালো প্রয়াস চালানো জরুরি।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার স্থল সীমান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু

বিলের লক্ষ্য হচ্ছে, ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমি বিনিময় এবং প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিত করা।

১. **ছিটমহল বিনিময় :** বাংলাদেশের কাছে থাকবে ভারতের ১১১টি ছিটমহল। যার আয়তন ১৭,১৫৮ একর। ভারতের কাছে থাকবে বাংলাদেশের ৫১ টি ছিটমহল। যার আয়তন ৭,১১০ একর। ভারতীয় ছিটমহলগুলোর বেশির ভাগই রয়েছে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। এসব ছিটমহলের ৫৯ টি লালমনিরহাটে, পঞ্চগড়ে ৩৬ টি, কুড়িগ্রামে ১২ টি ও নীলফামারীতে ৪ টি। বাংলাদেশের ৫১ টি ছিটমহলের অবস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহারে ৪৭ টি এবং জলপাইগুড়িতে ৪ টি। ইতোমধ্যে ছিটমহলে যৌথভাবে জনগণনার কাজ শেষ হয়েছে। ৩১ জুলাই মধ্যরাতে বা ১ আগস্ট ২০১৫ সম্পন্ন হয় ছিটমহল বিনিময়ের কাজ।

২. **অপদখলীয় জমি :** বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বিল অনুযায়ী বাংলাদেশ পায় পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসামের মোট ২,২৬৭.৬৮২ একর অপদখলীয় জমি। অপরদিকে ভারত পায় পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরার মোট ২,৭৭৭.০৩৮ একর অপদখলীয় জমি। আর সাড়ে ছয় কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত হয় দৈখাটা (পশ্চিমবঙ্গ), মহুরি নদী-বিলোনিয়া (ত্রিপুরা) ও লাঠিটিলা-ডুমাবাড়ি (আসাম)। নিচের রাজ্যভিত্তিক অপদখলীয় জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

↘ বাংলাদেশের কাছে থাকবে

ক. **পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ মোট জমি পায় ১,৯৫৭.৫৯ একর। নিচে এর অঞ্চলভিত্তিক পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :
বসুমারী-মাধুগাড়ী (কুষ্টিয়া-নদীয়া)-১,৩৫৮.২৫ একর।
আন্ধারকোটা- ৩৩৮.৭৯ একর।
বেরুবাড়ি (পঞ্চগড়-জলপাইগুড়ি)- ২৬০.৫৫ একর।

খ. **মেঘালয় :** মেঘালয়ের লোবাছেড়া-নুনছেড়া এলাকায় বাংলাদেশ মোট জমি পায় ৪১.৭০২ একর।

গ. **আসাম :** আসামে বাংলাদেশ মোট জমি পায় ২৬৮.৩৯ একর। নিচে এর অঞ্চলভিত্তিক পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :
ঠাকুরানিবাড়ি-কলাবাড়ি/বড়াইবাড়ি (কুড়িগ্রাম-ধুবড়ি)-১৯৩.৮৫ একর।
পাল্লাথাল (মৌলভীবাজার-করিমগঞ্জ)-৭৪.৫৪ একর।

↘ ভারতের কাছে যাবে

ক. **পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গে ভারত মোট জমি পায় ২,৩৯৮.০৫ একর। নিচে এর অঞ্চলভিত্তিক পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:
বেরুবাড়ি, সিংপাড়া-খুদিপাড়া (পঞ্চগড়-জলপাইগুড়ি)-১,৩৭৮.৯৯ একর।
পুকুরিয়া (কুষ্টিয়া-নদীয়া)-৫৭৬.৩৬ একর।
চরমহিশকুণ্ডি- ৩৯৩.৩৩ একর।
হরিপাল/এলএনপুর (পাতারি)-৫৩.৩৭ একর।

খ. **মেঘালয় :** মেঘালয়ে ভারতে মোট জমি পায় ২৪০.৫৭৮ একর। নিচে এর অঞ্চলভিত্তিক পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

পিরদিওয়া	-	১৯৩.৫১৬ একর।
লিংখাট- ১	-	৪.৭৯৩ একর।
লিংখাট- ২	-	০.৫৭৮ একর।
লিংখাট- ৩	-	৬.৯৪ একর।
ডাউকি/তামাবিল	-	১.৫৫৭ একর।
লালজুরি- ১	-	৬.১৫৬ একর।
লালজুরি- ৩	-	২৬.৮৫৮ একর।

গ. **ত্রিপুরা :** ত্রিপুরার চন্দনগর (মৌলভীবাজার-উত্তর ত্রিপুরা) এলাকায় ভারত মোট জমি পায় ১৩৮.৪১ একর। এভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার অপদখলীয় জমির হস্তান্তর হলে ভারত বাংলাদেশের চেয়ে ৫০৯.৩৫৬ একর (প্রায়) ভূমি বেশি পায়।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ছিটমহল বিনিময়ে খরচ : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের রাজ্যসভায় দেয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় বাস্তবায়নে ভারতে খরচ হবে ৩ হাজার ১ কোটি রুপি। তার মধ্যে অবকাঠামো তৈরিতে খরচ হবে ৭৭৫ কোটি, বাকি ২ হাজার ২৩৪ কোটি রুপি ছিটমহলের অধিবাসীদের, যারা ভারতে নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতে আসতে চাইবে তাদের পূণর্বাসনে খরচ হবে। বাংলাদেশে ভারতের ছিটমহলগুলোতে যে ৩৫ হাজার লোক বাস করে, তাদের সবার জন্য ২ হাজার ২৩৪ কোটি রুপি নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ছিটমহলের জন্য বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা না করলেও বর্তমান অর্থ-বছরের বাজেটে ছিটমহলের উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির ইতিবাচক দিকসমূহ : বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটলে ছিটমহলবাসী নানা ইতিবাচক সুবিধা ভোগ করবে। নিচে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির ইতিবাচক দিকসমূহ আলোচনা করা হলো :

০১. দ্বিপক্ষীয় সুবিধা বৃদ্ধি পাবে,
০২. ছিটমহলবাসী স্ব স্ব দেশের নাগরিকত্ব পাবে,
০৩. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে,
০৪. শিক্ষা সুবিধা বাড়বে,
০৫. বাণিজ্য সুবিধা বাড়বে,
০৬. ছিটমহলবাসী অবরুদ্ধ জীবন থেকে আলোর মুখ দেখবে,
০৭. রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত হবে,
০৮. সামাজিক অধিকার ভোগের সুযোগ পাবে,
০৯. রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হবে,
১০. রাস্তাঘাট সংস্কার হবে,
১১. গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ হবে,
১২. বিচ্ছিন্নতার অবসান হবে,
১৩. নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ইত্যাদি।

সীমান্ত চুক্তির ফলে এক অমানবিক ও মানহানিকর পরিস্থিতি থেকে ছিটমহলের মানুষগুলো মুক্তি পেয়েছে। উভয় দেশের সরকারকেই এখন ছিটমহলবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আমরা চাই ভারত যে আস্থা প্রদর্শন করেছে তা আরো সম্প্রসারিত করুক। পানি সমস্যার সমাধানেও ভারত আন্তরিক হোক। ভারত বড় দেশ হয়েও তার পার্শ্ববর্তী দেশকে সম্মান করতে জানে এটা প্রমাণ করুক।

বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের অর্জন আলোচনা করুন।

কোনো দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্য একটি দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে বিরাজমান ভূখণ্ড বা জনপদ হলো ছিটমহল। ছিটমহল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে যেতে হলে অন্য দেশের ভূমির ওপর দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের অর্জন :

ক. **ছিটমহল বিনিময়:** ভারতের লোকসভায় ছিটমহল বিনিময়, অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তর এবং অচিহ্নিত স্থলসীমানা চিহ্নিতকরণবিষয়ক চুক্তিটি অনুমোদিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১৭ হাজার ১৫৮ একর ভূমিসংবলিত ১১১ টি ভারতীয় ছিটমহলের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একইভাবে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা সাত হাজার ১১০ একর ভূমিসংবলিত ৫১ টি বাংলাদেশের ছিটমহলের ওপর ভারতের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী আপাতদৃষ্টিতে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পায় ১০ হাজার ৪৭ একরের অধিক ভূমি। কিন্তু বাস্তবতা হলো পরস্পরের ছিটমহল উভয় দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ার কারণে উভয় দেশের ছিটমহলের ওপর উভয়ের প্রতীকী দখল ছিল। সুতরাং চুক্তিটি কার্যকর হওয়ায় উভয় দেশের পারস্পারিক ছিটমহলস্থ ভুমির ওপর উভয় দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাই দখলের বিষয়টি প্রতীকী হওয়ায় এখানে কোনো দেশের অধিক বা কম ভূমি পাওয়ার বিষয়টির চেয়ে গৌণ বা মুখ্য হলো পরস্পরের ছিটমহলের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পাওয়া।

খ. **অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তর :** এ চুক্তিটির আওতায় অপদখলীয় ভূমিও হস্তান্তর করা হবে। অপদখলীয় ভূমি হচ্ছে বাংলাদেশের আইনসম্মত ভূমি, যা ভারতের দখলে রয়েছে। অনুরূপ বাংলাদেশের দখলে থাকা ভারতের আইনসম্মত ভূমি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার অনেক স্থানে দুই দেশের বাসিন্দারা সীমান্ত রেখা ছাড়িয়ে গিয়ে ভূমি দখল করে রেখেছে বছরের পর বছর। এসব বিরোধপূর্ণ ভূমি যাদের দখলে আছে তারা সে স্থানে কৃষিকাজও করছে। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ায় এসব ভূমি বহু বছর ধরে যাদের অপদখলে ছিল, তাদের ভূমি দখল ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে ভারতের দখলে আসবে অপদখলীয় ভূমির দুই হাজার ৭৭৭ একর এবং বাংলাদেশের দখলে আসবে অপদখলীয় ভূমি দুই হাজার ২৬৭ একর। র‍্যাডক্লিফ যেভাবে সীমানা চিহ্নিত করেছিলেন, অপদখলীয় ভূমি বিনিময়ের ফলে সে সীমানা রেখার কিছুটা হেরফের হবে। অপদখলীয় ভূমি বিনিময়ের কারণে বাংলাদেশ অতিরিক্ত ৫১০ একর ভূমির ওপর দখল হারাবে।

গ. **অচিহ্নিত সীমানা চিহ্নিতকরণ :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চার হাজার কিলোমিটারের বেশি স্থলসীমান্ত রয়েছে। এ দীর্ঘ সীমান্তের মধ্যে নীলফামারী ও পশ্চিমবঙ্গ, ফেনীর মুহুরী নদী ও ত্রিপুরার বিলোনিয়া এবং লাঠিটিলা-ভূমিবাড়ী ও আসামে ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা এখনো অচিহ্নিত রয়েছে। এ কারণে এসব এলাকায় মাঝেমধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। আশা করা যায়, সীমানা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর হওয়ায় এসব এলাকায় স্থায়ীভাবে সীমান্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটবে। যদিও ইতোমধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ঘ. **বন্ধুত্বের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়ন :** স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছিটমহল সমস্যার সম্মুখীন হয়। সীমানা সমস্যা সমাধানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের সংসদে তা অতি দ্রুত অনুসমর্থন করা হলেও ভারতের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি বলে সমস্যার সমাধান ঝুলছিল। ইত:পূর্বে বাংলাদেশের কোনো সরকারই ছিটমহল সমস্যা সমাধানে তেমন কোনো জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কিন্তু ২০০৮ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে ভারতের প্রতি। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে দফায় দফায় বৈঠক আর সফরের মাধ্যমে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এরই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়।

ঙ. **বর্তমান সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা :** ১৯৪৭ সাল থেকেই ছিটমহলবাসী মানবেতর জীবন যাপন করছিল। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ছিটমহলবাসীর দুঃখ দুর্দশার অবসানে সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ক্ষমতার পালাবদলে এ ব্যাপারে তেমন কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্থলসীমান্ত সমস্যা সমাধানের কাজ শুরু হয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর এবং ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ঢাকা সফরে এসে প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন। এর পর অমীমাংসিত সীমানা চিহ্নিত করা হয়। তখন বাংলাদেশ ওই চুক্তিতে অনুসমর্থন দিলেও জমি হস্তান্তরে ভারতের সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হওয়ায় বিষয়টি আটকে যায়। ভারতের বিগত কংগ্রেস সরকার কয়েক দফা উদ্যোগ নিয়েও বিজেপি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতায় রাজ্যসভা ও লোকসভায় তা পাস করাতে ব্যর্থ হয়। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের অংশ হিসেবে ৪১ বছর ধরে ঝুলে থাকা সমস্যাটি সমাধানের উদ্যোগ নেন। ২৬ নভেম্বর ২০১৪ কাঠমান্ডুতে ১৮তম সার্ক সম্মেলনের ফাঁকে এক বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্থল সীমান্ত চুক্তি কার্যকর এবং তিস্তা চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে 'জোর' প্রচেষ্টার কথা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সময় তিনি বাংলাদেশ সফরের আগ্রহের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানান। আর শুরু থেকে আপত্তি করে আসা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতাও নানা চাপের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এ চুক্তিতে সম্মতি দেন। এরপরই বাংলাদেশ সফর করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের নতুন পররাষ্ট্র সচিব সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর। ওই সময় তারা স্থল সীমান্ত চুক্তি কার্যকরের আশ্বাস দেন। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমান্ত চুক্তিটি ৫ মে ২০১৫ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পায়। এরপর ৬ মে ২০১৫ তা ভারতের রাজ্যসভায় এবং ৭ মে ২০১৫ লোকসভায় সর্বসম্মতিতে পাস হয়। পাসকৃত বিলে ভুল থাকায় ১১ মে ২০১৫ সে ভুল শুধরে তা রাজ্যসভায় পুনরায় উত্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। অতঃপর ৩১ জুলাই ২০১৫ রাত ১২ টায় বা ১ আগস্ট ২০১৫ সীমান্ত চুক্তি কার্যকর হয়। ফলে বাংলাদেশ ভারতের ৪১ বছরের ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়। এতে ১৬২ টি ছিটমহলের ৫১৫৪৮ জন বাসিন্দার দুর্বিসহ জীবনের অবসান ঘটে।

পরিশেষে বলতে পারি, দীর্ঘদিনের ছিটমহল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বর্তমান তথা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের বিরাট সাফল্য ও মহাঅর্জন। এ সরকারের বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কূটনৈতিক দক্ষতারই সুফল ছিটমহলবাসীর বন্দিজীবন থেকে মুক্তি। পাশাপাশি ভারত সরকারেরও রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।

বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তির ধাপ

উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বহুল প্রতিক্ষিত বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি সংবিধান সংশোধনী বিল ভারতীয় পার্লামেন্টে পাস হয় ৬ মে, ২০১৫ তে এবং নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিলটি পাস হয় ৭ মে, ২০১৫ তে। রাজ্যসভায় পাসের পর লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপিত হলে তা বিনা বাধায় গৃহীত হয়। পরদিন তা লোকসভায় উত্থাপিত হয় এবং অভূতপূর্বভাবে কোনো বিরোধিতা ছাড়া ৩৩১ ভোটে দীর্ঘ ৬৮ বছরের প্রতীক্ষায় অবসান ঘটিয়ে সর্বসম্মতভাবে বিলটি পাস হয়। এর ফলে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে সব ধরনের আইনি বাধা দূর হয়ে যায়।

বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তির ধাপসমূহ : বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তির প্রেক্ষাপট অনেক গভীরে প্রোথিত। নিচে এর পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সীমানা নির্ধারণ :** ১৯৪৭ সালে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমারেখা টানার পরিকল্পনা করেন লর্ড মাউন্টব্যাটন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ আইনজীবি সিরিল র‍্যাডক্লিফকে প্রধান করে সে বছরই গঠন করা হয় সীমানা নির্ধারণের কমিশন। ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই লন্ডন থেকে ভারতে আসেন র‍্যাডক্লিফ। মাত্র ছয় সপ্তাহের মাথায় ১৩ আগস্ট তিনি সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন। এর তিন দিন পর ১৬ আগস্ট জন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় সীমানার মানচিত্র। কোনো রকম সুবিবেচনা ছাড়াই হুট করে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি যথাযথভাবে হয়নি। ফলে উদ্ভব হয় এক মানবিক সমস্যার।

২. **ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান :** ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে দেশ বিভাজনের পরে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে যখন রংপুর চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে এবং কুচবিহার চলে যায় ভারতে। সমস্যার শুরু এখানেই। এই সমস্যা হবে জেনেই ব্রিটিশরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাঁরা "র‍্যাডক্লিফ কমিশন' গঠন করে দেশ বিভাজনের সীমানা নির্ধারণের কাজ করেছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের অদূরদর্শিতা, উভয় দেশের রাজাদের স্বার্থ, স্থানীয় জমিদারদের লোভ, তৎকালীন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বের নিকটস্থ চা বাগান মালিক ও ভূস্বামীদের প্রতি স্বজনপোষণ করতে গিয়ে সীমানা নির্ধারণের কাজটি সঠিকভাবে পারেনি। ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষের সাথে আলোচনা ছাড়াই তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়েছে অন্যদেশে, অপরদিকে ছিটমহল এলাকাগুলোর মানুষেরা হয়ে গিয়েছেন নিজভূমে পরবাসী।

৩. **নেহেরু-নুন সীমান্ত চুক্তি সম্পাদন :** ১৯৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আর পাকিস্তানের ফিরোজ খান নুন প্রথম সীমান্ত চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিতে ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি অপদখলীয় জমি বিনিময় ও সাড়ে ছয় কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে ভারতের তখনকার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সে দেশের সংবিধানের ১৪৩ ধারা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চান। তখন আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের সংশোধনীর মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। পরে ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় সংবিধান সংশোধনী আর জনগণনার অজুহাতে বিলম্বিত হয়েছে সীমান্ত সমস্যার সমাধান।

৪. **দিল্লি স্থলসীমান্ত চুক্তি :** সীমান্তের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলতে ১৯৭৪ সনের ১৬ মে দিল্লিতে স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভূমি হস্তান্তরের বিষয়ে চুক্তির তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে, ভূমি বিনিময়ের সময় লোকজন কোথায় থাকতে চান, সে ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পরপরই বাংলাদেশের সংসদে তা অনুসমর্থন করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের পক্ষে তা করা হয়নি। ফলে সমস্যার সমাধানও ঝুলে ছিল।

৫. **ভারতের অসহযোগিতা :** ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী, বেরুবাড়ীর উত্তর দিকের অর্ধেক অংশ ভারত এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর সংলগ্ন এলাকা পাবে বাংলাদেশ। চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভারতের অসহযোগিতায় তা মুখথুবড়ে পড়ে। ফলে বেরুবাড়ীর দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর ছিটমহলের সুরাহা হয়নি।

৬. **ছিটমহলের আলাদাভাবে তালিকা তৈরি :** ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পর দুই দেশ ছিটমহলের আলাদাভাবে তালিকা তৈরির কাজ শুরু করে। কিন্তু দুই পক্ষের তালিকায় দেখা দেয় গরমিল। পরে ১৯৯৭ সালের ৯ এপ্রিল চূড়ান্ত হয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১ টি ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১ টি ছিটমহল রয়েছে।

৭. **পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ে বৈঠক :** দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে যৌথ সীমান্ত কার্যদল জয়েন্ট বাউন্ডারি ওয়াকিং গ্রুপ-জেবিডব্লিউজি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এরপর এ পর্যন্ত চারটি বৈঠক করে ওই কমিটি। ২০১০ নভেম্বরে দুই পক্ষ দিল্লিতে বৈঠক করে ১৯৭৪ সালে চুক্তির আলোকে বিষয়গুলো সুরাহার সিদ্ধান্ত নেয়।

৮. **সীমান্ত প্রটোকল স্বাক্ষর :** ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে আলাদাভাবে ভারত বিষয়গুলো সুরাহার উদ্যোগ নেয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময়ও এ পথেই হাঁটে ভারত। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনমনীয় অবস্থানে ভারত পিছু হটে। ছাপা হওয়া চুক্তিতে হাতে লিখে ঘষামাজা করে ২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সীমান্ত প্রটোকলটি স্বাক্ষর করে দুই দেশ।

৯. **বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি :** বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি বিলটি ৫ মে ২০১৫ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পর ৬ মে ও ৭ মে যথাক্রমে রাজ্যসভায় ও লোকসভায় পাসের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে সংশোধনী আনার পর দীর্ঘ ৬৮ বছরের অমিমাংসিত বিষয়টি চূড়ান্তভাবে আলোর মুখ দেখে। ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রয়োজনীয় দলিলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে শুরু হয় চুক্তিটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। যার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় ৩১ জুলাই, ২০১৫ মধ্য রাতে অর্থাৎ ১ আগস্ট, ২০১৫-এর শুরুতে।

STUDENT STUDY

বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার করিডোর (BCIM)

অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে গঠিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোটের সফলতা বিভিন্ন দেশকে এ ধরনের জোট গঠনে উদ্বুদ্ধ করছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রথম অর্থনীতির দেশ চীন। দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ হল ভারত। মায়ানমারের রয়েছে বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ। বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচনা করছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার যে BCIM নামে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্ববহন করে।

➘ বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার করিডর (BCIM)

'বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার করিডর' (BCIM) অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণে দীর্ঘদিন থেকেই ৪ টি দেশ কাজ করছে। ২০১৩ সালের মে বিসিআইএম-এর আওতায় ইকোনোমিক করিডোর গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ব্যাপারে একটি সমীক্ষা পরিচালনায় একমত হয়েছে চীন ও ভারত। নতুন এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাটি 'বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার করিডর' (BCIM) নামে অধিক পরিচিত। কানেকটিভিটির মাধ্যমে এশিয়ার এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এক সময় মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন এ রুটে পণ্য বলতে সিল্কের আনাগোনা ছিল। সে কারণে মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ রুট ইতিহাসে 'সিল্ক রুট' নামে পরিচিত। কালের পরিক্রমায় রাজনৈতিক বিবর্তনে সিল্ক রুট এখন নেই। তবে এশিয়ায় চীনের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উত্থানে এবং ভারতে পুঁজির বিকাশের ধারায় সেই সিল্ক রুট নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। মন্দায় আক্রান্ত বিশ্বে এশিয়াকেই আগামী অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে সিল্ক রুট নিয়ে চীনের অগ্রসর হওয়ার সাথে পশ্চিমারা সরাসরি যুক্ত না হলেও নতুন সিল্ক রুটের ধারণা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ ধারণায় ভারতও যুক্ত হয়েছে। BCIM দেশগুলোতে জনগোষ্ঠীর বসবাস ২.৮ বিলিয়ন এবং অর্থনীতির আকার ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

➘ করিডোরের রুট

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ৪ টি দেশের প্রতিনিধিরা চীনের ইউনান প্রদ্রেশের রাজধানী কুনমিংয়ে মিলিত হযে এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন করে। ঐ আলোচনার সময়ই মূলত রুটটি ঠিক করা হয় এবং ৪ টি দেশই রুটটির ব্যাপারে সম্মত হয়। রুটটি হলো চীনের কুনমিং থেকে মিয়ানমারের মান্দালয় ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হয়ে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত।

➘ বাংলাদেশের সম্ভাবনা

BCIM আঞ্চলিক ইকোনমিক করিডোর চালু হলে বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হবে। এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত চীন এবং ভারতের অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা প্রত্যাশা করতে পারে। এগুলো হল-

১. **বাণিজ্য বৃদ্ধি :** BCIM ভুক্ত ভারত এবং মায়ানমারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পারলে বিশাল বাজার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য ইতোমধ্যে ভারত এবং মায়ানমারে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু অশুল্ক বাধা এবং দ্বি-পাক্ষিক সদিচ্ছার অভাবে বাংলাদেশ আশানুরূপ পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। BCIM কার্যকর হলে ভারত এবং মায়ানমারের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের বিরাট বাজার তৈরি করা সম্ভব।

২. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তি আমদানি :** বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করেছে। BCIM কার্যকর হলে ভারত থেকে আরো বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি সহজতর হবে। এছাড়া মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ অতি সহজেই গ্যাস আমদানি করতে পারে। তাই ভবিষ্যতে জ্বালানী সংকট মোকাবেলায় BCIM কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৩. **বিনিয়োগ প্রাপ্তি :** বাংলাদেশে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিয়োগ আসলেও প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত ও নিকট প্রতিবেশি চীন থেকে এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হয় নি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজির স্বল্পতা থাকায় বিদেশি বিনিয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা চীন এবং ভারতকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলবে।

৪. **প্রযুক্তি সহায়তা :** বর্তমানে চীনের প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। বাংলাদেশেও চীনের প্রযুক্তি আমদানি করা হচ্ছে। ভারতের বেশ কিছু প্রযুক্তিও বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য। তাই BCIM চালু হলে চীন এবং ভারত থেকে বাংলাদেশ সহজ শর্তে এবং স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি আনতে সক্ষম হবে।

৫. **স্বল্পমূল্যে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি :** বাংলাদেশের বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্পের কাঁচামালের জন্য চীন ও এবং ভারতের উপর নির্ভরশীল। BCIM কার্যকর হলে সহজ শর্তে এবং স্বল্পমূল্যে বাংলাদেশের শিল্পের কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে।

৬. **সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি :** অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশকে দাতা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। দাতা সংস্থাগুলো অযাচিত কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়ায় তাদের ঋণ গ্রহণ করেও দেশের অর্থনীতির চিত্র বদল করা যাচ্ছে না। তাই

বাংলাদেকে দাতা সংস্থাগুলোর বিকল্প কোন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে BCIM এর সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশের সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

৭. **পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব থেকে মুক্তি :** বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বের একক আধিপত্য থাকায় বাংলাদেশ বাধ্য হয়ে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব মেনে নেয়। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে BCIM প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমা শক্তির ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

৮. **কানেক্টিভিটি :** বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য কানেক্টিভিটি বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যকীয়। BCIM কার্যকর হলে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমার হয়ে চীনের সরাসরি সড়ক পথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচক উর্দ্ধমূখী রয়েছে। ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের একটি দেশে পরিণত হবে বলা ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রসরমান এই পরিস্থিতিতে BCIM প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ খুবই ইতিবাচক।

STUDENT STUDY রোহিঙ্গা সমস্যা

রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। পরবাসেও আশ্রয়দাতার গলার কাঁটা। শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তারা আশ্রয় খুঁজছে বেশ কয়েক দশক ধরে। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় ও দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা এখানো বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মিয়ানমারের এ রোহিঙ্গাদের জাতিসংঘ তার এক প্রতিবেদনে "বিশ্বের সবচেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের জাতিগত দাঙ্গায় আবারও জীবন্ত হয়ে উঠেছে রোহিঙ্গা ইস্যু। দেশটির পদদলিত সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গা জাতির ওপর নির্যাতনের ভুলে যাওয়া ইতিহাস আবারও ঝুলন্ত হয়ে উঠেছে।

রোহিঙ্গা কারা

নবম-দশম শতাব্দীতে আরাকান রাজ্য 'রোহান' কিংবা 'রোহাঙ' নামে পরিচিত ছিল। সেই অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবেই 'রোহিঙ্গা' শব্দের উদ্ভব। মিয়ানমার সরকার 'রোহিঙ্গা' বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। রোহিঙ্গারা পূর্বতন বার্মা, অধুনা মিয়ানমারের রাখাইন (আরাকান) রাজ্যের মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আরাকানি মুসলিমরা সেখানে হাজার বছর ধরে বসবাস করে এলেও বাংলাভাষী ও মুসলিম হওয়ার কারণে তারা (রোহিঙ্গারা) মিয়ানমার সরকার ও নাগকিদের কাছে 'বিদেশি', 'বাঙালি' বা 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণে রোহিঙ্গারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের কাছ থেকে চরম বৈরিতার শিকার হয়ে থাকে। বিশেষ করে বর্ণবাদী রাখাইনরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী নয়। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব স্বীকার না করলেও ইতিহাস কিন্তু তাদের পক্ষেই।

রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণসমূহ

মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক দাঙ্গা শুরু হয় আগস্ট ২০১৭। এ দাঙ্গায় বহু মুসলিম রোহিঙ্গা নিহত এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উদ্ভূত এ রোহিঙ্গা সমস্যার পিছনে একক কোনো কারণ নিহিত নয়, এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ ও বহু অতীত ইতিহাস। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বার্মা রাজার আরাকান দখল :** ১৭৮৪ সালের বার্মার রাজা বোদাফিয়া আরাকান দখল করেন। বর্মীরাজ বোদাফিয়া দীর্ঘ ৪২ বছর বার্মা শাসন করেন। তার দুঃশাসনে মুসলিম রোহিঙ্গারা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পৌঁছে। তিনি মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ করে দেন এবং মসজিদ, মাদরাসা ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলেন প্যাগোডা, বৌদ্ধবিহার, স্তূপ ইত্যাদি। মুসলমানদের বিতাড়িত করে সর্বোতভাবে আরাকানকে তিনি একটি বৌদ্ধভূমিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এ সময় বেশ কিছু আরাকানি মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৮২৩ সালে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ব্রিটিশ সরকার আরাকান ও বার্মা দখল করে নেয়।

২. **বার্মার স্বায়ত্তশাসন :** ১৯৩৭ সালে বার্মাকে হোম রুল বা স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং ব্রিটিশরা পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বাদ দিয়ে বর্মিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। ফলে বার্মার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ বার্মা বিশেষ করে আরাকানে অসংখ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এতে প্রায় এক লাখ মুসলমান নিহত এবং রোহিঙ্গারা অনেকেই নিজ

নিজ ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। ব্রিটিশদের তাড়াবার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বর্মিরা জাপানিদের পক্ষাবলম্বন করে। জাপানিদের আচরণ আরো তিক্ততার মনে হলে তারা মত পরিবর্তন করে ব্রিটিশদের সহায়তা করে। এর বিনিময়ে বার্মা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা লাভ করে।

৩. **জাতি-উপজাতি বিচ্ছিন্নতার দাবি :** স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বার্মার সংহতি সমস্যা প্রবল ওয়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি-উপজাতিগুলো বিচ্ছিন্নতার দাবি তোলে। ১৯৫৮ সালে আরাকান প্রদেশের কেরণ সম্প্রদায় রাজধানী রেঙ্গুনের পতন অনির্বার্য করে তোলে। ভারতের সাহায্য সহযোগিতায় সে বিদ্রোহ দমন করা হয়। এ সময় আরাকানি বৌদ্ধরা ক্ষমতা সংহত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনা করে।

৪. **নে উইনের ক্ষমতা দখল :** ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক নে উইন মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী সেনাপ্রধান নে উইন রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি কঠোর মনেভাব গ্রহণ করেন এবং ইতোপূর্বে স্বীকৃত অধিকার ও সুবিধাসমূহ বানচাল করে দেন। নে উইন বার্মার প্রচলিত বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বাতিল করে দেন। একমাত্র দল বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির নেতৃত্বে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রোহিঙ্গাদের কথা বলার যে সুযোগটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও তিরোহিত হয়।

৫. **১৯৪২ সালে রোহিঙ্গা হত্যা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৯৪২ সালে জাপানিরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে মিয়ানমার দখল করে নেয়। স্থানীয় রাখাইনরা এ সময় জাপানিদের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণকে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণের শিকার হয় মূলত (রোহিঙ্গা) মুসলমানরা। ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রাখাইন অধ্যুষিত মিমবিয়া ও ম্রোহাং টাউনশিপে প্রায় পাঁচ হাজার রাখাইনরা রোহিঙ্গাকে হত্যা করে।

৬. **রোহিঙ্গাদের পাল্টা প্রতিশোধ :** রোহিঙ্গা হত্যার পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে রোহিঙ্গারা উত্তর রাখাইন অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার রাখাইনকে হত্যা করে। সংঘাত তীব্র হলে জাপানিদের সহায়তায় রাখাইনরা রোহিঙ্গাদের কোণঠাসা করে ফেলে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার জাপানিদের দখলে থাকে। এ তিন বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে তৎকালীন বাংলায় চলে আসে। সে যাত্রা এখনো থামেনি। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা আবারও মিয়ানমার দখল করে নেয়। এই দখলে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। ব্রিটিশরা এ সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সহায়তার বিনিময়ে উত্তর রাখাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাজ্য গঠন করে দেবে তারা। কিন্তু অনেক প্রতিশ্রুতির মতোই ব্রিটিশরাজ এ প্রতিশ্রুতিও রাখেনি।

৭. **পূর্ব পাকিস্তান ও আরাকান রাজ্য সংযোগের প্রচেষ্টা :** ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগের সময় রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ আরাকান রাজ্যকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এ নিয়ে জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করেন রোহিঙ্গানেতারা। রোহিঙ্গারা একটি বড় সশস্ত্র গ্রুপও তৈরি করে এবং মংদু ও বুথিধাং এলাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ নেয়। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, রোহিঙ্গাদের এ উদ্যোগ ছিল আত্মঘাতী এবং মিয়ানমারে বৈষম্যের শিকার হওয়া পেছনে এটি একটি বড় কারণ। মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সেই সময়কার রোহিঙ্গা উদ্যোগকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে।

৮. **১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন পাশ :** ১৫ অক্টোবর ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা নাগরিকত্ব আইন প্রকাশ করে। এ আইনে মিয়ানমারে তিন ধরনের নাগরিকত্বে বিধান রাখা হয়- পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী এবং অভিবাসী। এ নতুন আইনে বলা হয়, ১৮২৩ সালে মিয়ানমারে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে মিয়ানমারে বাস করা ১৩৫ টি গোত্রভুক্ত মানুষই মিয়ানমারের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। রোহিঙ্গাদের গোত্র হিসেবে অস্বীকার করে সামরিক সরকার। আইনে 'সহযোগী নাগরিক' হিসেবে শুধু তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়, যারা ১৯৪৮ সালের নাগরিকত্ব অ্যাক্টে ইতিমধ্যেই আবেদন করেছে। এছাড়া 'অভিবাসী নাগরিক' (মিয়ানমারের বাইরে জন্ম নিয়েছে এমন মানুষদের নাগরিকত্ব) হিসেবে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়, যেগুলো 'যথাযথভাবে প্রমাণসাপেক্ষ' বলে বলা হয়। যারা মিয়ানমারের স্বাধীনতার আগে (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) এ দেশে প্রবেশ করেছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় ভাষায় দক্ষ এবং যাদের সন্তান মিয়ানমারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাই এ ধারায় নাগরিকত্ব পেতে পারে।

৯. **নাগরিক কার্য থেকে বঞ্চিত :** ১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার তিন ধরণের নাগরিক কার্ডের প্রচলন করে। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকদের জন্য গোলাপি, সহযোগী নাগরিকদের জন্য নীল এবং অভিযোজিত নাগরিকদের জন্য সবুজ রঙের কার্ড দেয়া হয়। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়াশোনা-চিকিৎসাসেবাসহ সব ধরনের কাজকর্ম এ কার্ডের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের কার্ড দেয়া হয় না। এর ফলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে মিয়ানমারে টিকে থাকা দূরূহ হয়ে পড়ে।

১০. **নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি :** মিয়ানমার জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। আর তাই 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত এসব রোহিঙ্গাকে রাখা হয়েছে কারাগারে। না, আট লাখ রোহিঙ্গাকে বন্দি করার মতো বড় কারাগার মিয়ানমার তৈরি করতে পারেনি, তাই রোহিঙ্গারা নিজ গ্রামেই বন্দি। মিয়ানমারের অন্য কোনো অঞ্চলে যাওয়ার কথা তো দূরূহ, পাশের গ্রামে যাওয়ারও কোনো

অনুমতি নেই তাদের। নিজ গ্রামের বাইরে যেতে হলে তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে ট্র্যাভেল পাস নিয়েই তারা গ্রামের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ট্র্যাভেল পাস পাওয়া কঠিন বিষয়। এ জন্য নাসাকাকে দিতে হয় বড় অঙ্কের ঘুষ। তার পরও রক্ষা নেই। যদি ট্র্যাভেল পাসে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ গ্রামে ফিরতে ব্যর্থ হয় কোনো রোহিঙ্গা, তা হলে তার নাম কাটা যায় এ গ্রামের তালিকাভুক্তি থেকে। সে তখন নিজ গ্রাম নামের কারাগারেও অবৈধ হয়ে পড়ে। তাদের ঠাই হয় জান্তা সরকারের জেলখানায়।

১১. **বিয়েতে বাধা :** ১৯৯০ সালে আরাকান রাজ্যে স্থানীয় আইন জারি করা হয়। আইনটিতে উত্তর আরাকানে বা আরাকানি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে বাস করা রোহিঙ্গাদের বিয়ের আগে সরকারি অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

১২. **জন্মনিয়ন্ত্রণ :** ২০০৫ সালে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। এ সময় দীর্ঘদিন বিয়ে সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়া সীমান্তরক্ষী বাহিনী। পরের বছর যখন আবার আবেদন গ্রহণ চালু হয়, তখন নিয়মকে করা হয় আরো কঠোর। তখন থেকে আবেদনের সাথে নবদম্পতিকে মুচলেকা দিয়ে বলতে হয় যে এ দম্পতি দুইয়ের অধিক সন্তান নেবে না।

১৩. **চিকিৎসা ও শিক্ষায় সীমিত অধিকার :** রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের নাগরিক অধিকার অনেক দূরের ব্যাপারে। সরকারি চাকরি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। উত্তর আরাকানের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রোহিঙ্গাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসেবা চালু আছে। কিন্তু এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখাইন এবং বার্মিজ নাগরিকরা স্থানীয় রাখাইন ভাষায় কথা বলার কারণে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে পূর্ণ চিকিৎসা নিতে পারে না। সরকারি বড় হাসপাতালে তাদের প্রবেশ পদ্ধতিগতভাবে নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ নিতে পারে না। এমনকি রোহিঙ্গা মহিলাদের জরুরি ধাত্রীবিদ্যা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েও মিয়ানমার সরকারের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেবা সংস্থাগুলো।

১৪. **ধর্ষণের অভিযোগ ও রোহিঙ্গা হত্যা :** ২০১১ সাল থেকেই নতুন করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তাদের প্রায়ই রোহিঙ্গা, বার্মিজ মুসলমান, কালার মুসলিম গোষ্ঠী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ২০১২ সালের ১ এপ্রিল উপনির্বাচনের অং সান সু চির জয়ের পর থেকে রোহিঙ্গাবিরোধী তৎপরতা বাড়তে থাকে। সু চির জয়ের দুই সপ্তাহ পরে কচির রাজ্যের হপকান্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। মধ্য মিয়ানমারে মগবি অঞ্চলে দাঙ্গাবাজরা আরেকটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় এবং স্থানীয় মুসলমানদের সম্পত্তি লুটপাট করে। এবারে নৃশংসতা শুরু হয়েছে এক বৌদ্ধ নারীর ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তিন রোহিঙ্গা ঐ নারীকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয় ১ জুন ২০১২। তবে পরে জানা যায়, ঐ ঘটনার সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু হামলা চালানোর জন্য একদল লোক মুখিয়ে ছিল। তারা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিধনযজ্ঞ শুরু করে ৩ জুন ২০১২। হত্যা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া, মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়াসহ নানাভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালানো শুরু হয়।

১৫. **সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা গণহত্যা :** ২০১৫ সালে মিয়ানমারে আবারও বড় ধরনের রোহিঙ্গা নিধন শুরু হলে আশ্রয়হীন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সতর্ক বাধার ফলে এ পর্যায়ে তারা বড় আকারে বাংলাদেশে প্রবেশে ব্যর্থ হয়। তখন তাদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় আশ্রয় নেয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে নতুন করে রোহিঙ্গা নিধন অভিযান শুরু করেছে মিয়ানমার সরকার। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক একশত ও এর বেশি রোহিঙ্গা গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নতুন করে সৃষ্ট সহিংস নীতিতে এরই মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও উগ্র রাখাইন বৌদ্ধদের বীভৎস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে প্রাণ বাঁচাতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে আরও ছয় লাখের বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা দশ লাখেরও বেশি। বর্তমানে এদের আগমনের ঢল এখনও অব্যাহত রয়েছে। রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী এবং রাখাইন বৌদ্ধদের এবারের রোহিঙ্গা নির্যাতনের ঘটনায় এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

➘ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উপায়

শুধু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবেই নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ ও বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে হলেও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা জরুরি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে আমি মনে করি।

১. **কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার :** রোহিঙ্গা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়দেশের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা উচিত। এক্ষেত্রে ভারত ও চীনের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিতে পারে।

২. **দ্বিপাক্ষিক আলোচনা :** রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উত্তম হাতিয়ার হলো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। উভয় দেশ নিজ নিজ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে পারে।

৩. **রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব প্রদান সম্পর্কিত যে কালো আইন প্রণয়ন করে তাতে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তাই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষ্যে হয় ১৯৮২ সালের আইন বাতিল করতে হবে নতুবা আইনটির সংস্কার করতে হবে।

৪. **জাতিসংঘ কর্তৃক মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ :** সুদীর্ঘকাল থেকে জিইয়ে থাকা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মিয়ানমারকে আইনের আওতায় এনে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

৫. **মুসলিম বিশ্ব ও ওআইসি কর্তৃক চাপ প্রয়োগ :** সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের সরকারের নির্দেশে রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনী যে নির্যাতন পরিচালনা করছে সে লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্ব ও ওআইসি বিশ্ব জনমত গঠনের মাধ্যমে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৬. **সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদয় মনোভাব :** মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনী মূলতঃ সরকারের নির্দেশে রোহিঙ্গাদের উপর প্রতিনিয়ত নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনী এ নিষ্ঠুর মনোভাব থেকে বেরিয়ে সদয় মনোভাবের আশ্রয় নিলেও অনেকাংশে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান হতে পারে।

৭. **সরকারের মানবিক উদ্যোগ :** মিয়ানমারের সরকার মানবিক হয়ে স্বৈরাচারের খোলস থেকে বেরিয়ে আসলেও রোহিঙ্গা সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারে।

৮. **রোহিঙ্গাদের সম্পদে পরিণত :** মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের সমস্যা না ভেবে তাদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে।

৯. **বন্দিত্বের অবসান :** মিয়ানমার সরকারের রোষানলে পড়ে রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি অবস্থায় আছেন দীর্ঘদিন। রোহিঙ্গাদের এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত কিনা

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে কোনোভাবেই আশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। কেননা ১৯৭৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার শুরু করে 'অপারেশন নাগামিন' বা 'ড্রাগন রাজ'। এ অপারেশনে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার নামে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় রাখাইনরা। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ১৯৭৮ সালের মে মাসের মধ্যে কমপক্ষে দুই লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যার বোঝা বাংলাদেশ আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। এ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা দেশের জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করছে। পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশের পাসপোর্ট গ্রহণ করে রোহিঙ্গারা বিদেশে যাচ্ছে। তাই শুধু ভাষা, ধর্ম কিংবা নৃতাত্ত্বিক গঠনের সাদৃশ্য থাকার কারণেই মিয়ানমারের ২০ লাখ রোহিঙ্গাদের দায় বাংলাদেশ নিতে পারে না। অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে মিয়ানমারের বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-

১. জনসংখ্যা চাপ বৃদ্ধি পাবে,
২. অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাবে,
৩. মিয়ানমারের সাথে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হবে,
৪. দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে,
৫. মাদক ও চোরাচালানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে,
৬. সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে ইত্যাদি।
৭. বিদেশে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে।

অপ্রত্যাশীতভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে। যা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। সাম্প্রতিক সময়েও এটি আরও ঘনিভূত হয়েছে। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের কোনো ভাবেই স্বীকার করতে চাচ্ছে না। বহু অভিবাসীদের সঙ্গে রোহিঙ্গারাও থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া উপকূলে ভাসছে- যে সংকটের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। ইতোমধ্যে যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি নিজ জন্মভূমিতে যাতে নাগরিক হিসেবে রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

STUDENT STUDY

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র

প্রবাসী শ্রমিক, রেমিট্যান্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্র গাঁথা। কারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশি শ্রমিক। বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বের অস্থিতিশীল রাজনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সংকুচিত হয়ে আসছে দেশের অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা রেমিট্যান্স প্রবাহ। আরব দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রায় লক্ষাধিক জনশক্তি দেশে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কমে যাচ্ছে তাদের রেমিট্যান্স। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার রেশ কাটতে না কাটতে বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এ সংকটে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রেমিট্যান্স-নির্ভর অর্থনীতি এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার : বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিশাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারাবিশ্বে অন্তত ৯৫ লাখ বাংলাদেশি বৈধভাবে চাকরি নিয়ে বিদেশে গমন করেছেন, যার প্রায় ৭০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২০ সালের মে পর্যন্ত গমনকারী বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ৪১ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৪ জন, যা মোট রপ্তানিকৃত জনশক্তি ২৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মোট জনশক্তির ৫৭%ই সৌদি আরব গমন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭.১০ লাখ বাংলাদেশি নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছেন। সংখ্যার বিচারে সৌদি আরবের পরে বর্তমানে ওমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ৭২,৬৫৪ জন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন- কুয়েতে ৫ শতাংশ, কাতারে ৫ শতাংশ ও লিবিয়ায় ১ শতাংশ বাংলাদেশি শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশিষ্ট ২৫ শতাংশের মালয়েশিয়া (৮ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৬ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ১১ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশি শ্রমশক্তি। উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ সময় জনশক্তি রপ্তানি ২৭ গুণ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স চিত্র : ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ শুরু হয়। ঐ বছর মোট রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৩৫.৮৫ কোটি টাকা। এরপর প্রতিবছরই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ১৮২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে কয়েক বছর যাবত এককভাবে সৌদি আরবের পরই সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবস্থান। বিশ্বব্যাংকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সের ফ্রাক্ট বুক- ২০২০ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে রেমিট্যান্স অর্জনে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম, যার পরিমাণ প্রায় ১,৫৩০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স অর্জনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান।

আরব, মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ : আরব বিশ্বজুড়ে এখন রাজনৈতিক সুনামি চলছে। সেই সুনামি আঘাত হানছে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট। আন্দোলনের ভয়ে তটস্থ সিরিয়া, জর্ডান, ইয়েমেন, মরক্কো, বাহরাইন, এমনকি সৌদি আরবও। তিউনিসিয়ার বেন আলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সুনামি শুরু হয়। এতে ঝরে পড়েন বেন আলী। একই পরিণতি বরণ করেন মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। পরবর্তীতে ভয়াবহ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার নেতা কর্ণেল গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হন ও নিহত হন। সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে এছাড়া করোনা ভাইরাসের কারণে সমগ্র বিশ্বের শ্রম বাজার এখন নিম্নমুখী। জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) হিসেবে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৈধ চ্যানেলে কাতার থেকে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ১০১৯.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কাতার থেকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ৩৫৯.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় সৌদি আরব ৪০১৫.১৬, সংযুক্ত আরব আমিরাত ২৪৭২.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ ২০১২-১৩ অর্থবছরেও এই দুই দেশ থেকে রেমিট্যান্স এসেছিল যথাক্রমে ৩৮২৯.৪৫ মিলিয়ন ও ২৮২৯.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু এসব দেশের বাংলাদেশি জনশক্তি আমদানির প্রতি বিমুখতা এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট দুইয়ে মিলে দেশের জনশক্তি রপ্তানি, জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রমবাজার সংকট, সম্ভাবনা ও করণীয় : দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সেবা মাধ্যম জনশক্তি রপ্তানি বা প্রবাসী আয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজার সংকটহেতু জনশক্তি রপ্তানিতে বিপর্যয় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রতিনিয়তই স্থবির করে তুলছে। প্রায় তিন বছর ধরে জনশক্তি রপ্তানির নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশে মানুষরূপী অমানুষদের পদচারণ ও অপতৎপরতার বাংলাদেশিদের ভাবমূর্তি সংকট, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কূটনৈতিক

তৎপরতার অভাবসহ নানাবিধ কারণ এর পেছনে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে রাজনৈতিক সংকটে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার প্রবণতায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে যোগ করেছে সংকটের নতুন মাত্রা। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হয়েও হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৬ বছর পর (১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) সৌদি আরবে জনশক্তি পাঠানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখা এ বৃহৎ খাতটির স্থবিরতা দূর করা প্রয়োজন সবার আগে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে চাহিদার ভাটা পড়লেও পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অনেক অনেক এগিয়ে যাওয়া দেশগুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের যে ধাক্কা লেগেছে তা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে নতুন করে শ্রমবাজার পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রয়োজন দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতারে নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশিদের কাজ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সামনে সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশের জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের উর্ধ্বমূখী গ্রাফ ধরে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান । এক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম বাজার এক বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

STUDENT STUDY জনশক্তি রপ্তানি

অর্থনীতির জনশক্তি রপ্তানির গুরুত্ব

০১. **ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স :** বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় ২৮ টি দেশে শ্রম রপ্তানিকারক যার মধ্যে পেশাজীবি, দক্ষ, অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক রয়েছে। বিশ্বে সাত মিলিয়নেরও বেশি বাংলাদেশি শ্রমশক্তি রয়েছে যার মধ্যে চার মিলিয়ন শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে রয়েছে। প্রতি বছর বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ গড়ে প্রায় ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রতি বছরই এর পরিমাণ বাড়ছে। এখন এটি পোশাক শিল্পের রপ্তানি অংশ বাদ দিলে দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে অবৈধ হুন্ডির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইন সংশোধনসহ বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠানোর কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। অর্থনীতি হচ্ছে ধীরে ধীরে শক্তিশালী।

০২. **গতিশীল অর্থনীতি :** অর্থনীতির পরিভাষায়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হচ্ছে যেকোনো দেশের অর্থনীতির জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেশটির সার্বিক অর্থনীতির হালচাল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৮ ভাগেরও বেশি আসে এখাত থেকে। তারপরও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একক খাত হলো প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। কেননা পোশাক রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় হয় ব্যাক টু ব্যাক এলসি বা কাঁচামাল আমদানীতে। আর এ কারণেই বলা যায়, প্রবাসীরাই সচল রেখেছেন অর্থনীতির চাকা।

০৩. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** দেশীয় অর্থনীতিতে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ্য করা যায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এর প্রতিফলন দুভাবে ঘটে। ক. বেকার জনগোষ্ঠী বিদেশে স্থানান্তর, খ. তাদের প্রেরিত অর্থে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

০৪. **জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত জনশক্তির অধিকাংশই গ্রামীণ জনগণ। এ বিপুল জনশক্তির প্রেরিত অর্থ গ্রামীণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

০৫. **কৃষি উন্নয়ন :** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ কৃষক পরিবারগুলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে অতিরিক্ত অর্থের এ যোগান সার্বিক কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া পূর্বের ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলোও বিভিন্নভাবে বিদেশে চাকরি পাওয়ার সুবাদে ন্যূনতম কৃষিজমির মালিক হচ্ছে।

০৬. **বিনিয়োগ :** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ দেশের বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ অর্থ যোগানের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে আমানত ও বিনিয়োগের বিভিন্ন স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য লাভজনক করমুক্ত সুদ/মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি স্বদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন এ জাতীয় স্কিমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

ক. অণিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদি আমানত (Non-resident Foreign Currency Deposit-NFCD).

খ. ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড;

গ. পোর্ট ফোলিও বিনিয়োগের জন্য অনাবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাবে (Non-resident Investors Taka Account-NITA).

০৭. **দারিদ্র্য বিমোচন :** বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা এ সকল জনশক্তির অধিকাংশই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত যাদের প্রেরিত অর্থ তাদের নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

০৮. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস :** বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি রয়েছে এ জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে তা বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

০৯. **আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষা :** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা রাখে তা হলো এ অর্থ দেশের আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং এ কথা স্বীকার্য যে, জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশ একই সাথে বেকারত্ব হ্রাস, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস, উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে এখনই প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শুধু সরকারকে নয় নিজ নিজ ভূমিকায় সকলকে অবতীর্ণ হতে হবে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এত বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা আমাদের জন্য বোঝা নয় বরং আশীর্বাদ স্বরূপ।

জনশক্তি রপ্তানির নেতিবাচক প্রভাব

বৃহত্তর অর্থে জনশক্তি রপ্তানি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। যেমন-

ক. **আয় বৈষম্য :** জনশক্তি রপ্তানি থেকে অর্জিত আয় যে সকল পরিবারে আসে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অল্প সময়ে এসব পরিবারে অন্যদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ আসায় সমাজে আয় বৈষম্য হয়।

খ. **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি :** বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ আয়-ব্যয় ও মূল্যের স্বাভাবিক মাত্রার ওপরেও প্রভাব ফেলে। কেননা অর্থের অতিরিক্ত যোগানের ফলে বিদেশগামী পরিবারগুলোর ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে ত্বরান্বিত করে।

গ. **পুনর্বাসন সমস্যা :** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় কারো চাকরি স্থায়ী নয় বরং চুক্তি ভিত্তিক। তাই চুক্তি শেষে এসব শ্রমিক যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়।

ঘ. **সামাজিক অস্থিরতা :** বিশ্ব শ্রমবাজারে বিভিন্ন সময়ের বিপর্যয়, রিক্রুটি এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণা, বিদেশি নিয়োগকারীদের দুর্ব্যবহার ও হয়রানি এবং অন্যান্য কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও বিদেশে যেতে ব্যর্থ হওয়া বা অল্প সময়ের ব্যবধানে ফিরে আসা প্রভৃতি কারণে অনেক পরিবারই সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অনেকে ভিটে মাটি হারিয়ে রাস্তায় নামে; অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবার ও তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্যকারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে প্রায়ই চাকরি প্রার্থী বনাম দালাল, দালাল বনাম এজেন্সি, চাকরি প্রার্থী বনাম অর্থ দিয়ে সাহায্যকারী এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মাঝেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হতে দেখা দেয়।

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

ক. **শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা ও শ্রমিকের দক্ষতার অভাব :** আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বর্তমানে প্রতিযোগিতা ব্যাপক। এ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদাই বেশি। অথচ আমাদরে শ্রমিকদের প্রায় ৪৭.৪০ শতাংশ অদক্ষ।

খ. **অবৈধ উপায়ে লোক প্রেরণ :** বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের ফলে অনেক শ্রমিকই বিদেশে গিয়ে অবৈধ শ্রমিকে পরিণত হয় এবং নিয়োগকর্তা, পুলিশ, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নির্যাতনের শিকার হয়েও কোনো আইনগত সহায়তা নিতে পারে না।

গ. **শ্রম বাজার সম্পর্কে ধারণার অভাব :** আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ অধিকাংশই নিম্ন মজুরিতে অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে থাকে।

ঘ. **বিদেশে বাংলাদেশি মিশনগুলোর অসহযোগিতা :** শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিদেশে বাংলাদেশি মিশনগুলোর অসহযোগিতার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মিশনগুলোর উদাসীনতা, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতির পাশাপাশি শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাবও দায়ী।

ঙ. **প্রেরিত অর্থের অদক্ষ ব্যবহার :** অভিবাসী শ্রমিকদের বিপুল পরিমাণ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণে তাদের অনাগ্রহ থেকে যেমন প্রেরিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায় তেমনি প্রেরিত অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা, অতিরিক্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনে আনা, পারিবারিক ও আচার অনুষ্ঠানে বেহিসেবি খরচ প্রভৃতি কারণে এ টাকার বিপুল অংশ অপচয় হয়।

চ. **দক্ষতার প্রমাণপত্রের অভাব :** আমাদের দেশে অনেক লোক আছে যারা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ কিন্তু তাদের কোনো সার্টিফিকেট নেই। এমতাবস্থায় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তার কাঙ্ক্ষিত চাকরিটা পায় না।

ছ. **বৈদেশিক নিয়োগকারীদের প্রদেয় বৈদেশিক মুদ্রা :** বিদেশে আমাদের দেশের শ্রমিকরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার একটা বিরাট অংশ পুনরায় বৈদেশিক নিয়োগকারী এজেন্টদের কাছে চলে যায়।

জ. **বিদেশে নিয়োগকারীদের হয়রানি :** বিদেশে নিয়োগকারীরা শ্রমিকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে। শ্রমিকদের কাগজপত্র জব্দ করে নেয়, মূল চুক্তি বাতিল করা, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি এর অন্যতম।

জনশক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

০১. **মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা :** বিশ্ববাজারে বিদেশি শ্রমিকদের চাহিদার পরিবর্তনের গতিশীলতার দিকে দৃষ্টি রেখে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যেসব শ্রমিক বর্তমানে বিদেশে কর্মরত আছেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে যাতে তারা যেসব কাজে উচ্চতর দক্ষতা প্রয়োজন যেসব চাকরির জন্য বিবেচিত হতে পারেন। আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council কে পুণর্গঠন করে সরকারি ও বেরসকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে বেসরকারি উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে হবে।

০২. **মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা :** দেশে এবং বিদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ ও জোরদার করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে BMET-এর মনিটরিং ইউনিকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানও জরুরি।

০৩. **যোগ্য ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান :** যেসব শ্রমিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ, সরকারের উচিত তাদেরকে যথাযথ সার্টিফিকেট প্রদান করা।

০৪. **উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবর্ধক কর্মসূচি :** জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি কেবল শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টা ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থার কাছে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের উচিত এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। সে জন্য সরকারের যা করা উচিত তা হলো-

প্রথমত- দেশত্যাগপূর্ব সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ (Pre-departure Awareness Building Training) গ্রহণকে সকল শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা।

দ্বিতীয়ত- প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে টিকে থাকার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা জরুরি।

তৃতীয়ত- যেসব দক্ষ শ্রমিক তাদের সংশ্লিষ্ট Informal Sector-এ রয়েছে সরকারের উচিত তাদেরকে প্রয়োজনীয় ভাষা জ্ঞান ও হিসাব-নিকাশের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেয়া।

০৫. **পুনর্বাসন :** দেশে ফেরার শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্য, ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা আবশ্যক, যাতে তারা তাদের অর্জিত সম্পদ ও অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

০৬. **বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের নেটওয়ার্ক সৃষ্টি :** বিদেশ ফেরত শ্রমিক ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের দাবি দাওয়া ও সমস্যাবলী গ্রন্থিকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার জন্য একটি সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক আবশ্যক।

০৭. **আমানত ও বিনিয়োগ স্কিম :** সহজ ও দক্ষ বিনিয়োগ স্কিমের প্রবাসী শ্রমিকের অর্থ খাটানো এবং সঞ্চয়ের ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও উৎসাহব্যাঞ্জক করা আবশ্যক, যেন দেশে ফিরে তাদের পুনর্বাসন সহজ হয়।

০৮. **দূতাবাসের সক্রিয় ভূমিকা :** বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে শ্রমিকদের প্রয়োজনে সাড়া দানের উপযোগী করতে হবে। সেজন্য-

প্রথমত- সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের Labour Attache-কে শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ও তাদের অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত- দূতাবাসকে শ্রমিকদের আইনত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সরবরাহ এবং দূতাবাসে তাদের নাম অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে।

তৃতীয়ত- শ্রমিকদের আইনত বৈধতা-অবৈধতা নির্বিশেষে সকল শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চতুর্থত- শ্রমিকদের যাবতীয় অভিযোগ দূতাবাসকে অবহিত করার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহী করতে হবে।

০৯. **কার্যকর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি ও সংস্থা :** জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর একটা আঞ্চলিক ফোরাম থাকা আবশ্যক এবং এক্ষেত্রে SAARC-কে ভিত্তি করেই তা গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া সম্ভাব্য শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনও গুরুত্বপূর্ণ।

১০. **ডাক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সংস্কার :** ডাক ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে এতে স্বচ্ছতা আনা আবশ্যক, যাতে প্রবাসী শ্রমিকরা এ সকল বৈধ মাধ্যমে তাদের অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং সরকারও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত না হয়।

১১. **শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার :** বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তাকে কর্মমুখি করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রেড কোর্স চালু এবং উচ্চতর পর্যায়ে কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দেয়া জরুরি।

১২. **প্রেরিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে এ ব্যাপারে নাগরিক পর্যায়ে উৎসাহী করতে হবে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অর্থকে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

১৩. **নতুন শ্রমবাজারের সন্ধান :** জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন বাজার তৈরির চেষ্টা করতে হবে। এটা প্রমাণিত যে, রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। যেহেতু দেশে বেকারত্বের হার অনেক বেশি সেহেতু নতুন জনশক্তি রপ্তানি বাজার তৈরি বেকারত্বের হার কমাবে, পাশাপাশি অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখবে।

১৪. **অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সিকে শাস্তি প্রদান :** অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির কারণে লোকজন প্রতরিত হয়ে বিদেশের মাটিতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় দেশের ভাবমূর্তি যেমন ক্ষুণ্ন হচ্ছে সাথে সাথে জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসায়ও ধস নামছে। এত কিছুর পরও মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করায় পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ক কার্যকরোপযোগী নীতিমালা প্রস্তুত করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

১৫. **ইমিগ্রেশন খরচ কমানো:** দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি ইমিগ্রেশনের খরচ কমানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। তা না হলে বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখ যোগ্য হারে কমে যাবে। কেননা শ্রীলঙ্কা বা ফিলিপাইনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি টাকা খরচ করে শ্রমিকদের বাংলাদেশ থেকে যেতে হয়।

STUDENT STUDY

GSP

GSP তথা Gereralised System of Preference এর বহুল পরিচিত অর্থ হচ্ছে 'বিশেষায়িত বাণিজ্য সুবিধা বা শুল্কমুক্ত কোটা সুবিধা' World Trade Organization (WTO) কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার বাইরে গিয়ে কোনো দেশকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যা শুল্কমুক্ত কোটা সুবিধা হিসেবে পরিচিত। WTO-এর নিয়মানুযায়ী যদি কোনো উন্নত দেশ অন্য কোনো দেশকে MFN (Most

Favoured Nations) ক্যাটাগরিভূক্ত করে থাকে তবে ঐ ক্যাটাগরীর বিশেষত: উন্নয়নশীল সকল দেশকেই সে সকল সুবিধা দিতে হবে। WTO-এর এই নিয়মের বাইরে গিয়ে উন্নত বিশ্ব উন্নয়নশীল কোনো কোনো দেশকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ব্যাপারে GSP সুবিধা দিয়ে থাকে। GSP যেমন Tariff Free হতে পারে, আবার এটি Tariff কমানোর মাধ্যমেও হতে পারে। সাধারণত: GSP সুবিধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং EU-ই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ে থাকে।

উল্লেখ্য : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল ১২৭ টি দেশকে প্রায় ৫,০০০ পণ্যের উপর GSP সুবিধা দিয়ে থাকে। GSP সুবিধার বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ-

০১. সাধারণত: উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই সুবিধা দিয়ে থাকি।

০২. এই সুবিধার কোনো বিনিময় ব্যবস্থা থাকে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটির রাজনৈতিক ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

০৩. GSP সুবিধা ভিন্ন হতে পারে, এর পণ্যসমূহও ভিন্ন হতে পারে। যেমন: যুক্তরাষ্ট্র যে পণ্যগুলোর উপর GSP সুবিধা দেয়, EU সেই পণ্যগুলোতে GSP সুবিধা নাও দিতে পারে।

০৪. ২০০১ সালে থেকে ইউরোপের দেশগুলো 'Every Thing But Arms'-এই নীতিতে GSP সুবিধা দিয়ে আসছে।

৫. ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম GSP সুবিধা চালু করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের GSP সংক্রান্ত আইনটি ২১ অক্টোবর, ২০১১-তে গৃহীত হয়। আর EU ২১ অক্টোবর ২০১২-তে বিষয়ে সর্বশেষ আইন প্রণয়ন করে।

মূলত : উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখার জন্য এই সুবিধা দেয়া হয়। তবে এটির রাজনৈতিক ব্যবহারেরও অভিযোগ আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশকে প্রদত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের GSP সুবিধা বাতিল নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হচ্ছে। US সিনেটের কোনো কোনো সদস্য গার্মেন্টেস কারখানার নিম্নমান ও শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে প্রশাসনকে GSP সুবিধা বাতিলের অনুরোধ করেছেন। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা স্থগিত করেছে।

GSP (Generalized System of Preference) একটি টেরিফ মওকুফ পদ্ধতি যা WTO (World Trade Organization) ভূক্ত MFN (Most Favored Nation) দেশ সমূহ একই সংস্থাভুক্ত অপরাপর স্বল্পন্নোত/উন্নয়নশীল দেশ সমূহ থেকে পণ্য (নির্ধারিত) আমদানীর ক্ষেত্রে প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত দেশ সমূহে গার্মেন্টস জন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এই GSP সুবিধা পেয়ে আসছে। GSP সুবিধার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত দেশ সমূহে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেক্স মওকুফ/ duty free entry সুবিধার কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক GSP প্রদানকারী দেশের ক্রেতাদের কাছে স্বল্পমূল্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের GSP সুবিধা যে কারণে হুমকির সম্মুখীন

০১. **শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি কাঠামো :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশের ইতিহাস মূলত এই শিল্পের শ্রমিক শোষণের ইতিহাস। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ২৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্যদ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। অথচ শ্রমিকদের দেওয়া হয় নাম মাত্র মজুরি। যে কারণে দেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও এই খাতের শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নে তেমন কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এ জন্য বাংলাদেশের GSP সুবিধা স্থগিত করা হয়েছে।

০২. **অনুন্নত কর্ম পরিবেশ :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্ম পরিবেশ অত্যন্ত নিম্ন মানের। শিল্প কারখানার প্রতিটি ফ্লোরে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি নির্গমণ পথসহ বেশ কিছু নীতিমালা কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে তা কদাচিত চোখে পড়ে। শ্রমিকদের নিম্ন কর্মমানেও কর্ম পরিবেশের ফলে শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত নানা সমস্যায় পড়তে হয় এমনকি মৃত্যু ঝুঁকিও রয়েছে। এ সব কথা বিচেনায় নিয়ে বাংলাদেশের GSP সুবিধা স্থগিত করেছে।

০৩. **অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোর নিরাপত্তা অত্যন্ত অনুন্নত, অপ্রতুল এবং নাজুক। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি দুর্ঘটনায় সহস্রাধিক শ্রমিকের প্রাণহানি এর প্রমাণ। অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অভাব, ঝুঁকি ভবনে কারখানা স্থাপন, জরুরি নির্গমণ পথের অভাব, ভবন নির্মাণ নীতিমালা অনুসরণ না করা প্রভৃতি কারণে শ্রমিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে, যা GSP সুবিধা স্থগিতের জন্য দায়ি।

০৪. **শ্রমিক নেতা আমিনুল হত্যাকাণ্ড :** ২০১২ সালের জুন মাসে শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলাম হত্যাকাণ্ড GSP সুবিধা স্থগিতের দাবিকে আরো জোরদার করছে। তাঁর শরীরে প্রচুর নির্যাতনের চিহ্ন ছিল এবং বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী তাকে হত্যা করে বলে সাংবাদিকদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এখনো এই মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে কূটনীতিক ও শ্রম বিষয়ক কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য মতে এ মামলার সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে।

০৫. **তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড :** গত ২০১২ সালে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় তাজরিন ফ্যাশন নামের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে সংগঠিত হয়। ফলে কমপক্ষে ১২১ জন শ্রমিক আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। কারো কারো মতে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি। ২০১৩ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সরকারি তদন্তদল নথির অভাবে এখানে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা জানাতে আবারো ব্যর্থ হয়। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক'শ শ্রমিক আহতও হয়। যা GSP সুবিধা স্থগিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

০৬. **কারখানা ভবন ধ্বস :** ২০০৫ সালে স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস্ ভবন ধ্বসে ৬৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু এবং আরো প্রায় ৮০ জন শ্রমিক আহত হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে এ বছর সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসে ১,১২৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু এবং কয়েক হাজার শ্রমিক আহত হয় এ ঘটনায়। এ ধরনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহল বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়েছে। এ ঘটনাগুলো বাংলাদেশের GSP সুবিধা স্থগিতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষটক হিসেবে কাজ করছে।

০৭. **মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের অবস্থান :** সাম্প্রতিক ঘটনার বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসম্যানরা United State Trade Representative কে লিখিত এক চিঠিতে বাংলাদেশের GSP সুবিধা স্থগিতের পক্ষে মত দেন।

০৮. **পোশাক শিল্প মালিকদের অতি মাত্রায় লাভের মনোভাব :** পোশাক শিল্পের মালিকরা শ্রম পরিবেশ, শ্রমিকের জীবনমান, মজুরি, শ্রমনিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু চেষ্টা করেছে কত সস্তায় শ্রমিককে ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবসায় কতবেশি লাভ করা যায়। তাদের মুনাফা লিপ্সু এই মনোভাবের কারণে শ্রম পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের শিল্প পরিবেশ নিয়ে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

০৯. **আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নৈতিবাচক প্রচারণা :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের কর্ম পরিবেশ ও শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী অনেক মিডিয়া নৈতিবাচক খবর প্রচার করছে যা বাংলাদেশের GSP সুবিধা স্থগিতের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

১০. **যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিরোধিতা :** যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের GSP সুবিধা বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে। ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন American Federation of Industrial Labor Organization (AFILO) বাংলাদেশের GSP সুবিধা বাতিলের জোর দাবি তোলে। তারা এখনো সে দাবিতে আন্দোলন করছে।

১১. **TICFA বাস্তবায়নের চাপ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে TICFA চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রকাশ্য কোনো ফোরামে কথা না বললেও এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য হাতিয়ার হিসেবে GSP সুবিধা কে ব্যবহার করছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী সভায় TICFA চুক্তি খসড়া হয়েছে।

১২. **প্রতিযোগী দেশের লবিং :** বাংলাদেশের পাশাপাশি চীন, ভারত, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ এই শিল্পে বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী এই দেশগুলো বাংলাদেশের GSP সুবিধা বাতিলের জন্য আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের বিপক্ষে লবিং করছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর GSP সুবিধা বাতিলের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হল

➘ নেতিবাচক প্রভাব

০১. **রপ্তানি আয় হ্রাস :** GSP সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কিছুটা কমে যাবে। দেশের শিল্পখাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েত পারে। বিদেশি ক্রেতাদের আগ্রহ কমে যাওয়ার সাথে সাথে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ কমে আসবে।

০২. **বেকারত্ব বৃদ্ধি :** তৈরি পোশাক শিল্প থেকে GSP সুবিধা প্রত্যাহার হলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে অসম প্রতিযোগিতার ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পগুলো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। বেকার হয়ে পড়তে পারে এশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা, যাদের ৮৫ শতাংশই মহিলা।

০৩. **বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিক্ষুণ্ন :** GSP সুবিধা বাতিল হলে বিদেশে বাংলাদেশের শিল্প সম্পর্ককে বিরূপ ধারণা তৈরি হবে এবং বিদেশি ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্বাস যোগ্যতা হারাবে। এর ফলে বিদেশে বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।

০৪. **শ্রম বাজারের ওপর চাক বৃদ্ধি পাবে :** GSP সুবিধা প্রত্যাহার হলে দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে যাবে এবং শ্রমিকদের বাড়তি চাপ পড়বে দেশের শ্রমবাজারে। শ্রমিকের জীবনমান আরো নিচে নেমে যাবে।

০৫. **উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত :** দেশের রপ্তানি আয় হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি, অর্থের অবমূল্যায়ন, সামাজিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সরকারকে বাড়তি চাপের সম্মুখীন হতে হবে।

০৬. **শিল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত :** GSP বাতিলের ফলে দেশের গোটা শিল্পের উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়বে, নতুন শিল্পস্থাপন সম্ভব হবে না। শিল্পস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সংকট, সংকুচিত বিশ্ব বাজার পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে দেশের শিল্পের বিকাশ মারাত্মক ঝুকির সম্মুখীন হবে।

০৭. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধা :** বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৩৮ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক শিল্পখাত থেকে। GSP প্রত্যাহারের ফলে রপ্তানি আয় কমে গেলে বাংলাদেশ কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে, যা দেশকে নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির দেশে পরিণত করবে।

০৮. **অর্থের অবমূল্যায়ন বৃদ্ধি :** তৈরি পোশাক শিল্প খাত থেকে GSP বাতিল হয়ে গেলে রপ্তানি আয় কমে আসবে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসবে এর ফলশ্রুতিতে দেশের টাকার মূল্যমান আরো নিচে নেমে যাবে, প্রকৃত আমদানি ব্যয় বেড়ে যাবে বেশ খানিকটা।

০৯. **বিদেশি ক্রেতাদের আস্থার সংকট সৃষ্টি :** তৈরি পোশাক শিল্পে GSP সুবিধা প্রত্যাহারের ফলে দেশের সার্বিক শিল্প ব্যবস্থার উপর বিদেশিদের অনাস্থা তৈরি হতে পারে। তৈরি পোশাক ছাড়াও অন্যান্য বাংলাদেশি পণ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি ক্রেতাদের আস্থার সংকট দেখা দেবে।

১০. **শ্রম মূল্যের অধঃগতি :** ক্রমাগত বেকারত্ব বৃদ্ধির দরুণ দেশে শ্রমিকের সরবরাহ বেড়ে যাবে। শ্রমিকের মজুরি দিন দিন কমে যাবে। শ্রম মূলের অধঃগতির দরুণ শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা ও জীবন মান দু'ই কমে যাবে।

১১. **Back Ward Linkage & Forward Linkage শিল্পে ধ্বংস :** GSP সুবিধা বন্ধ হয়ে গেলে এর ওপর নির্ভরশীল Backward linkage ও Forward linkage শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বাধ্য হয়ে এই শিল্পগুলোর উৎপাদন কমে যাবে এবং হুমকির মুখে পড়বে এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা।

১২. **অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি :** GSP সুবিধা বাতিল হলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

১৩. **নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হবে :** তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত ৮৫ শতাংশ কর্মী মহিলা। তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত এই শ্রমিকরা তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনার পাশাপাশি পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ শিল্পের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তাদের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

ইতিবাচক প্রভাব

০১. **আন্তর্জাতিক মানের শিল্প স্থাপন :** বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্পের কর্মপরিবেশসহ বিশ্বমান বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হবে। সরকার দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হবে। বাংলাদেশের শিল্প আন্তর্জাতিক মান লাভ করবে।

০২. **ইমারত নীতি মালার বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশে বিদ্যমান দুর্নীতি, পেশি শক্তির ব্যবহার, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অধিকাংশ ইমারত মালিক দেশের প্রচলিত বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করেই ভবন নির্মাণ করছে। কখনো কখনো আবাসিক ভবনে স্থাপন করা হচ্ছে শিল্প কারখানা। এসব ক্ষেত্রে দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য না থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের চাপে ভবন নির্মাণ নীতিমালা অনুসরণ করবে।

০৩. **শ্রমের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করণ :** আপাতত GSP সুবিধা বাতিল হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাময়িক প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে শ্রমিক শোষণ রোধ হবে, শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে।

০৪. **শ্রমিক বেতন বৃদ্ধি :** GSP সুবিধা বাতিল হলে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পেতে পারে।

০৫. **আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল :** গার্মেন্টস মালিকরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

০৬. **মানোন্নয়নের চেষ্টা :** প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশ পোষাকের মান উন্নয়নের চেষ্টা করবে।

০৭. **নির্ভরশীলতা হ্রাস :** দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমবে।

০৮. **রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস :** বাংলাদেশকে এসব বিষয় (Like GSP) দিয়ে যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়, তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

০৯. **শিল্পে স্থিতিশীলতা :** পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারলে শিল্পে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।

১০. **দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ সরকার, মালিক ও শ্রমিকরা নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে আরো সচেতন হবেন।

GSP সুবিধাপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত বাংলাদেশের পণ্যের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির শতকরা ০.৫৪ ভাগ ২০১১ সালের হিসেবে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার (সূত্র : Financial Express, 25 March, 2013)। অথচ ঐ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪.৮৮ বিলিয়ন ডলার।

তবে GSP সুবিধা বাতিল হলে বাংলাদেশের ইমেজে প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া এর ফলে ইউরোপও বাংলাদেশকে এই সুবিধা দেবে কিনা অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে GSP সুবিধা বহাল রাখবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা বিতর্ক উঠতে পারে। এসব কারণে বাংলাদেশ সরকার GSP সুবিধা ধরে রাখতে সচেষ্ট।

তৈরি পোশাক শিল্প

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থনীতি এখন পোশাক শিল্প তথা বৈদেশিক মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতি। যা অভ্যন্তরীন সংকট মোকাবেলা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৮ শতাংশ আসে পোশাক রপ্তানি থেকে। রপ্তানি বাণিজ্যকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন বলা হয়। নিম্নে তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

ক. বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পোশাক শিল্পের বিকাশ বাংলাদেশের বেকার জনশক্তি বিশেষ করে অদক্ষ ও অশিক্ষিত মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

খ. বাংলাদেশ মূলত আমদানী ও বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর দেশ। নিত্য ব্যবহার্য পণ্য থেকে শুরু করে সামগ্রিক ব্যয়ভার এর জন্য বাংলাদেশ ঋণ করে থাকে। পোশাক শিল্পের বিপুল রপ্তানি আয় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত মজুদ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

গ. পোশাক শিল্পে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রায় ২ কোটি জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে যা অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

ঘ. শিপিং ব্যবসা, বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধি, সড়ক পথ, রেলপথ ও বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং সরকারের আয় বেড়েছে তথা বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

ঙ. দেশি কাপড়ের বিশাল বাজার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ৭০-৮০ কোটি মিটার কাপড় প্রস্তুত করে। এ খাতকে আরো সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চ. পোশাক শিল্প দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানকে উজ্জ্বল করেছে।

ছ. পোশাক শিল্পে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক কাজ করার ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। ফলে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে।

জ. পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে এদের সন্তানদের শিক্ষা লাভ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা আশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ

০১. **নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানি করতে না পারা :** আমদানিকারকগণ পোশাক ডেলিভারির নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেন। এ নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য ডেলিভারি করতে না পারলে আমদানিকারকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পের সুনাম ব্যাহত হয়। বিদেশীরা বিকল্প প্রতিষ্ঠান খুঁজতে থাকে।

০২. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও অদক্ষ।

০৩. **উচ্চসুদের হার ও স্বার্থান্বেষী চক্র :** বাংলাদেশের সাথে তৈরি পোশাক শিল্পে প্রতিযোগিতাকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণে সুদের হার দুই থেকে তিনগুণ বেশি শিল্প মালিকরা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ব্যাংকের নানামুখী শোষণ, বঞ্চনা, সর্বক্ষেত্রে চরম অসহযোগিতা-অনিয়মের ফলে ও উচ্চ হারে সুদের কারণে ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে বাধ্য হচ্ছে পোশাক শিল্পের কারখানা বন্ধ করে দিতে।

০৪. **শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি :** শ্রমিক সহজলভ্যতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পোশাক শিল্প মালিকরা শ্রমিকদেরকে তাদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করছে। আট ঘণ্টার কাজ বার বা ষোল ঘণ্টা করিয়েও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দিক নির্দেশনা দিলেও শিল্প মালিকরা তা মানছে না বা মানতে টালবাহানার আশ্রয় নিচ্ছেন।

০৫. **বিশ্ববাজারে মূল্যহ্রাস :** গত কয়েক বছরে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। নীট পোশাকের মূল্যও কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। চীন, ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ কম মূল্যে পোশাক সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বেশ চাপে রয়েছেন।

০৬. **গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট :** বিদ্যুৎ ও গ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে পোশাক রপ্তানিকারকরা সমস্যায় পড়ছেন। পোশাক উৎপাদনকালীন এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। গ্যাসের চাপ কম থাকায় উদ্যোক্তারা গ্যাস জেনারেটরও ব্যবহার করতে পারেন না। ডিজেলচালিত জনারেটর দিয়ে উৎপাদন করার কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৭. **রপ্তানি সীমাবদ্ধতা :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১১৫ প্রকারের পোশাকের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহের চাহিদা রয়েছে ৮৫ রকমের পোশাকের। অথচ বাংলাদেশ মাত্র ৩৬ রকমের পোশাক উৎপাদন করতে সক্ষম। উৎপাদনের এ সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অপর একটি বড় সমস্যা।

০৮. **মূলধনের স্বল্পতা :** বিশ্বের উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশেরই শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় মূলধন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ সমস্যার সম্মুখীন। বাংলাদেশের প্রভূত সম্ভাবনাময় পোশাক শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা উচিত যথাসময়ে যথাযথভাবে সে পরিমাণ ব্যাংকসমূহ বা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে পারছে না।

০৯. **অনুন্নত অবকাঠামো ও অব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অপর একটি সমস্যা হলো অনুন্নত অবকাঠামো। বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, কালভার্ট, হাসপাতাল প্রভৃতির অবস্থা যথেষ্ট নাজুক। তাছাড়া রয়েছে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দরজনিত অব্যবস্থাপনা ও বন্দরের অভাব।

১০. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ছিনতাই, হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, অপহরণ, প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন একের পরক ঘটেই চলছে। এরূপ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পোশাক শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণে সুপারিশমালা

০১. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা :** বাংলাদেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে হলে প্রথমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা শিল্পাঞ্চলগুলোর সাথে বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল, সড়ক, আকাশ পথে পরিবহন ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। অপরদিকে দ্রুততার সাথে গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

০২. **Backward Linkage Industry :** কোটামুক্ত বিশ্ববাজারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য Backward linkage industry বা পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প স্থাপন করতে হবে। নতুন নতুন স্পিনিং ও উইভিং নীট শিল্প স্থাপন করতে হবে।

০৩. **Forward Linkage Industry:** Forward linkage industry স্থাপন করে বহুমুখী বাজার অন্বেষণ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তুলতে হবে।

০৪. **পোশাক শিল্পকে আয়করমুক্ত করা:** পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে আয়কর মুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের আয় সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত করে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

০৫. **পোশাকের শ্রেণি বৃদ্ধি করা :** বিশ্ববাজারে ১১৫ রকমের পোশাকের চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশের মাত্র ৩৬ রকমের পোশাক তৈরি করতে পারঙ্গম। কাজেই বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের পোশাকের শ্রেণি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

০৬. **শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

০৭. **বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করা :** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমূহ সম্ভাবনাকে অবহিত করতে বিদেশে প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে। লবিস্ট নিয়োগ করলে তারা বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে পারবে। ফলে এদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। বিজিএমইএ ইতিমধ্যে দুটি লবিস্ট ফার্মকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ধরে রাখার জন্য নিয়োগ করেছে।

০৮. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে :** দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শিল্পোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক ঘোষিত হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতির কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পখাত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সমস্যার সমাধানকল্পে পোশাক শিল্পখাতকে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

০৯. **আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন তথা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করা :** পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানসম্মত পোশাক তৈরি করা। আর এজন্য উন্নত প্রযুক্তির আমদানি করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

১০. **টেক্সটাইল পল্লী প্রতিষ্ঠা করা :** সুতা, বস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল যত কম স্থানান্তর করা যাবে, উৎপাদন ব্যয় তথা অপচয় ততো কমবে। তাই টেক্সটাইল পল্লী প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার।

স্বাধীনতা - উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জন

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল পশ্চিমা শাসকবর্গের শাসন-শোষণের ফল। নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মত্যাগ ও ভারত-সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার চূড়ান্ত প্রতিফলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। আর এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

➘ স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনসমূহ

কূটনীতি, বৈদেশিক নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, শিক্ষা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ ও প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন আশাতীত। নিচে স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো-

০১. **ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফেরার পথে ভারতীয় কূটনীতিক শশাংক শেখর ব্যানার্জির সাথে আলোচনা ও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা মোতাবেক ১৭-১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

০২. **বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি :** স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ভূটান (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১) এবং ভারতের (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১) স্বীকৃতি লাভ করে। বড় বড় পরাশক্তির নিকট থেকে তাই স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা বাংলাদেশের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক দক্ষতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ ১১৬ টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশের সংখ্যা ১৫০ টি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ ইরাক (৮ জুলাই, ১৯৭২), প্রথম মুসলিম এবং আফ্রিকান দেশ সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২) এবং প্রথম আমেরিকান দেশ বার্বাডোস (২০ জানুয়ারি, ১৯৭২)।

০৩. **মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক :** স্বাধীনতা উত্তরকালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের আরেকটি বড় সাফল্য হলো মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রনায়কই কম বেশি বিদেশের সাথে সসুম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যার দরুণ বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ আজ ব্যাপকভাবে পরিচিত।

০৪. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ :** স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর দক্ষ ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। মুজিব পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সরকারের আমলে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ, ওআইসি ও আইডিবির সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ CEDAW, UNHCR, UNFPA, UNICEF, IMO, HFA, UNPKO, IPU, ITU, CPA, INTERPOLE, IMSO, WITSA, ILO, ACO প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

০৫. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শুধুমাত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদই লাভ করেনি, পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলাদেশ ঠিক তেমনি বর্তমানকালেও তা অব্যাহত রয়েছে। যেমন- ২০১৪ সালে CEDAW-এর সদস্য পদে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন ইসমাত জাহান। ২০১৪ সালে বিশ্বের ১৬৪ টি দেশের আইনসভার সংগঠন আইপিইউ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশ্ববাসীকে অবাক করে বাংলাদেশের দশম সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী সিপিএ এর ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউরোপের বাইরে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ক্যাপ্টেন মঈন আইএমএসও এর মহাপরিচালক নির্বাচিত হন ২০১৫ সালে।

০৬. **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সাফল্য :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ ১৫ জন সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন মিশনে অংশ নিয়ে এ পর্যন্ত ৩৭ টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৯ টি দেশের ৫৪টি মিশনে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে ৭টি চলমান মিশনে বাংলাদেশ কাজ করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাফল্যের দরুন সিয়েরালিওন বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা সংগঠিত শান্তিরক্ষি বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

০৭. **মাতৃভাষা আন্তর্জাতিকীকরণ :** মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ ব্যক্তির আত্মদানে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। তাই বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আর তাই এ বিরল ঘটনার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের UNESCO কর্তৃক ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। মাতৃভাষার এ আন্তর্জাতিকীকরণ বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সাফল্য।

০৮. **সমুদ্র বিজয় :** দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় ও অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিরল। প্রতিবেশি রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমুদ্রবিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন নজির স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক আইনের ওপর আস্থা রেখে এবং সমুদ্রে বাংলাদেশের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি প্রয়াগ করে ইন্টান্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দি ল অব দি সি (ITLOS, ১৪ মার্চ ২০১২) এবং পার্মনেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন (CPA, ৮ জুলাই ২০১৪)-এর রায়ে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয় রচিত হয়। এই রায় ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮ শত ১৩ বর্গ কি. মি. সমুদ্র অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এই সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ব্যাপক সম্পদ আহরণের পাশাপাশি নতুন নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ পেয়েছে।

০৯. **এমডিজির আংশিক লক্ষ্য পূরণ :** বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। এমডিজির মোট ৮ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪, ৫ ও ৬ নং লক্ষ্য অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, এইচআইভি এইডস ও ম্যালেরিয়া দমনে বাংলাদেশ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এছাড়া ১, ২ ও ৩ নং লক্ষ্য যথা-দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা নিবারণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্য এমডিজির লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০. **আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ :** গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। ২০১০ সালে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফসলে হাসান আবদেন যুক্তরাজ্যের নাইট উপাধি লাভ করেন। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সেবা কর্মসূচি ও সুরক্ষায় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্মার্ট' এর সনদ লাভ করেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা 'ব্র্যাক'। এ সম্মাননা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ও নেতৃস্থানীয় আরও ৬৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১০ সালে বাংলাদেশ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, ২০১৪ সালে ডিজিটাল ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ও শিক্ষার প্রসারে ভূমিকার জন্য সাউথ সাউথ পুরস্কর ও ২০১৩ সালে দারিদ্র বিমোচনের জন্য সাউথ সাউথ (আইওএসএসসি) পুরস্কার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ-২০১৫ পুরস্কার লাভ এবং আরো নানাবিধ পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলাদেশকে সম্মানজনক স্থানে আসীন করেছে।

১১. **পোশাক রপ্তানিতে সাফল্য :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্যাপক সুনাম বয়ে এনেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রেতা। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ৪% রপ্তানি করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্লেষকদের মতে, ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১০% এ উন্নীত হতে পারে।

১২. **আবিষ্কার :** ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা ডেটাসফটের একজন উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্ঠায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সফলভাবে উন্মোচিত হয় পাটের জিনোম সিকোয়েন্স বা পাটের জীবনরহস্য। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এই বিজ্ঞানী। পাট ছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে পেঁপে, মালয়েশিয়ার হয়ে রাবারসহ মোট আটটি উদ্ভিদের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কারের ঘোষণা দেন।

১৩. **খেলাধুলা :** আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জন কম নয়। ৩১ মার্চ, ১৯৮৬ সালে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে), ১৯৯৭ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্বীকৃতি, আরো পরে ২০০০ সালে আইসিসি'র ১০ম পূর্ণ সদস্য হিসেবে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ সালে টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসে বাংলাদেশে। জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হোয়াইট ওয়াশ (বাংলা ওয়াশ) করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করে। ৩৮তম জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করেছে যথাক্রমে গ্রান্ড মাস্টার নিয়াজ মোরশেদ, জিয়াউর রহমান ও রিফাত বিন সাত্তার। এছাড়া অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন ও গলফ খেলাতেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

১৪. **জাতিসংঘের অধিবেশনে অংশগ্রহণ ও ভাষণ :** ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এর কয়েকদিন পর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী ভঙ্গুর নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থীদের সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এতে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

১৫. **এভারেস্ট জয় :** ২০১০ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন মুসা ইব্রাহিম। এরপর ২০১১ সালের ২১ মে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন এম এ মুহিত। ২০১২ সালের ১৯ মে নিশাত মজুমদার এবং সর্বশেষ ওয়াসফিয়া নাজনীন ২০১৩ সালের ২৬ মার্চ সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট চূড়া জয় করেন। মুসা ইব্রাহিম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরীন এবং মো. খালেদ হোসেইন বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। এদের মধ্যে ওয়াসফিয়া নাজরীন সাত মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের খ্যাতি অর্জন করেন।

STUDENT STUDY সংক্ষিপ্ত

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিট্যান্স খাতের অবদান

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হলো রেমিট্যান্স খাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শুধু রেমিট্যান্স বাবদ এসেছিল ১৫.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

➘ **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের অবদান :** রেমিট্যান্সকে আমাদের অর্থনীতির ফুসফুস বলা যেতে পারে। এটি একদিকে আমাদের চাহিদা পূরণ ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে প্রায় ১ কোটি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। যেমনটি নিচের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান-

১. **বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে :** বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ আমদানি নির্ভর বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি হওয়ায় অন্তত বাণিজ্য ঘাটতির সমপরিমাণ অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এই ঘাটতিটুকু বাংলাদেশ প্রাপ্ত রেমিট্যান্স থেকে পূরণ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৮৬ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার এবং রেমিট্যান্স ছিল ১৮২০৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার দুই-তৃতীয়াংশই ব্যয় হয়েছে বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে।

২. **রিজার্ভ বৃদ্ধিতে :** বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। একটি দেশের আমদানি সক্ষমতা প্রকাশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন অত্যধিক বেশি। সাধারণত তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ থাকতে হয়। বাংলাদেশের যে পরিমাণ রিজার্ভ রয়েছে তা দিয়ে ছয় মাসের বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। যা দেশের আমদানি সক্ষমতাকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে।

৩. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে :** শ্রমশক্তি জরিপ ২০২০ অনুযায়ী এ দেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৫ লাখ (প্রায়), যার মধ্য থেকে ১ কোটির কাছাকাছি বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। যদি বৈদেশিক কর্মসংস্থান তৈরি না হতো তাহলে দেশের বেকারত্বের হার ১৮-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেত। তাই রেমিট্যান্সের সাথে কর্মসংস্থানের ব্যাপারটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

৪. **অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিনিয়োগ :** ২০১৯ সালে প্রকাশিত বিসিএসের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর রেমিট্যান্স থেকে ২.৫ শতাংশ টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। এর মধ্য থেকে সিংহভাগ টাকাই ব্যয় হয় প্রবাসীদের বাড়িঘর নির্মাণ ও মেরামতে।

৫. **জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে :** জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে রেমিট্যান্সের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। বিবিএস প্রকাশিত ২০১৯ সালের ঐ রিপোর্টে দেখা যায় প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ৭৮% ব্যয় হয় সংসার চালাতে। প্রবাসী আয়ের ৩৯ শতাংশ ব্যয় হয় শুধু খাদ্যের সংস্থানে এবং আরো ৩৯ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষা, যাতায়াত, পোশাক কেনাসহ নানা ধরনের খাদ্য বহির্ভূত পণ্যে যা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৬. **নারীর ক্ষমতায়নে :** পরিবারের প্রধান হিসেবে প্রবাসী আয়ের খরচ করার দায়িত্ব নারীর হাতেই রয়েছে। জাতীয়ভাবে দেশে ১৬ শতাংশ খানার প্রধান নারী। অথচ প্রবাসী আয় আছে এমন খানা বা পরিবারগুলোর ৪৮ শতাংশের প্রধান নারী। তারাই সংসার চালান, প্রবাসী অর্থ খরচ করেন। সুতরাং নারীদের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে রেমিট্যান্স নারীদের ক্ষমতায়নে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র বিবরণ

বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নে একটি দ্রুত বর্ধনশীল দেশ। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর এ দেশের অর্থনীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ৪৫তম স্থান দখল করেছে। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের জিডিপি ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাড়িয়েছে ২৭,৯৬,৩৭৮ কোটি টাকায়। মাথাপিছু জিডিপি ও আয় যথাক্রমে ১,৯৭০ মার্কিন ডলার ও ২,০৬৪ মার্কিন ডলার।

গত পাঁচ বছরের জিডিপি'র বিবরণ : ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির আকার হলো ২৭,৯৬,৩৭৮ কোটি টাকা। যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.০৫%। অথচ এক সময় এই ধারায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অলীক মনে হতো। ২০০৫-০৬ অর্থবছরেও বাংলাদেশের জিডিপির আকার ছিল মাত্র ৪,৮২,৩৩৭ কোটি টাকা। অথচ এখন তা কয়েকগুণ বেড়ে ২৭ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। নিচের সারণিতে গত ছয় বছরে বাংলাদেশের জিডিপির মাথাপিছু জিপি ও মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তনের চিত্র দেখানো হলো :

অর্থবছর	জিডিপি (টাকায়)	মাথাপিছু জিডিপি	মাথাপিছু আয়
২০১০-১১	৯১৫৮২৯ কোটি	টাকায় ৬১১৯৮	৬৬০৪৪
		ডলারে ৮৬০	৯২৮
২০১১-১২	১০৫৫২০৪ কোটি	টাকায় ৬৯৬১৪	৭৫৫০৫
		ডলারে ৮৮০	৯৫৫
২০১২-১৩	১১৯৮৯২৩ কোটি	টাকায় ৭৮০০৯	৮৪২৮৩
		ডলারে ৯৭৬	১০৫৪
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬৭৪ কোটি	টাকায় ৮৬২৬৬	৯২০১৫
		ডলারে ১১১০	১১৮৪
২০১৪-১৫	১৫১৩৬০০ কোটি	টাকায় ৯৫৮৬৪	১০২০২৬
		ডলারে ১২৩৫	১৩১৪
২০১৫-১৬	১৭,২৯,৫৬৭ কোটি	ডলারে ১৩৮৪	১৪৬৬
২০১৬-১৭	২০,৮৭,৫৮০ কোটি	টাকায় ১,২০,৯৩১	১,২৫,৯৯৯
		ডলারে ১৫৩৮	১৬০২
২০১৭-১৮	২২,৩৮,৪৯৮ কোটি	টাকায় ১,৩৬,৭৮৬	১,৪২,৮৬২
		ডলারে ১৬৭৭	১,৭৫২
২০১৮-১৯	২৫,৪২,৪৮৩ কোটি	টাকায় ১,৫৩,১৯৭	১,৬০,০৬০
		ডলারে ১,৮২৭	১,৯০৯
২০১৯-২০	২৭,৯৬,৩৭৮ কোটি	টাকায় ১,৬৬,৮৮৮	১,৭৪,৮৮৮
		ডলারে ১,৯৭০	২,০৬৪

উপরের ছকটি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, ছয় বছরের ব্যবধানে জিডিপি বেড়েছে ৮৯ শতাংশের বেশি, মাথাপিছু জিডিপি বেড়েছে ৬১ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ৫৮ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৩.০১ শতাংশ, ২৭.৩৮ শতাংশ ও ৫৪.৬১ শতাংশ, যা সাত বছর পরে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৩৫ শতাংশ, ৩৫.৩৬ শতাংশ ও ৫১.৩৫ শতাংশ। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমেছে এবং শিল্পখাতের অবদান বেড়েছে। অন্যদিকে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান মোটামোটি স্থির রয়েছে। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি অনেক দূর এগিয়েছে। বিগত কয়েক বছর যাবত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.২৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

উন্নত প্রায় প্রতিটি দেশ শিল্পে উন্নত দেশ। যে দেশ শিল্পে যত উন্নত সে দেশ বিশ্বে ততো অগ্রসর। মূলত শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। জীবনযাত্রার মানে অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। তাই প্রতিটি দেশ শিল্পে উন্নত হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। বাংলাদেশও ধীরে ধীরে শিল্পে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩২ শতাংশের বেশি, যা ১৯৭২ সালে ১০ শতাংশের কম ছিল। বাংলাদেশ শিল্পায়নের ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেলেও এখনো এ খাতে রয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ শিল্পায়নে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাচ্ছে না। নিচে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. **নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাব :** শিল্পায়নের প্রাণ হলো নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ। গ্যাস ও বিদ্যুৎ ছাড়া উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। অথচ নিয়মিত হারে শিল্প ইউনিটগুলোতে গ্যাস ও বিদ্যুতের বিভ্রাট লেগে থাকে। এতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের উৎপাদন থেকে শিল্পখাত বঞ্চিত হয়। যার প্রভাব দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পড়ে।

২. **জমির স্বল্পতা :** শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য জমির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ এমনিতেই পৃথিবীর ছোট একটি দেশ। এখানে জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি বছর ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে ফসলী জমির পরিমাণও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এমন অবস্থায় শিল্প কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমির যোগান বাংলাদেশে অপ্রতুলই বলতে হয়।

৩. **পরিকল্পিত শিল্পায়নের অনুপস্থিতি :** শিল্পায়ন ছাড়া যেমন কোনো দেশ উন্নত হতে পারে না। তেমনি পরিকল্পিত শিল্পায়ন ছাড়া কোনো দেশ অগ্রসর হতে পারে না। বাংলাদেশের যত্রতত্র, আনাচে কানাচে অনুপযুক্ত জায়গায় শিল্প কারখানার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা মূলত শিল্প ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতেও সমস্যার কারণ ও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এভাবে পরিকল্পনাহীনভাবে যেখানে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় অর্থনৈতিক সুবিধা কম ভোগ করছে দেশের শিল্পখাত।

৪. **সাশ্রয়ী মূলধন ও কাঁচামালের অভাব :** শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন হয় মূলধনের। অধিকাংশ সময় উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো সুদের হার দুই অংকের বেশি থাকায় উদ্যোক্তারা সাশ্রয়ীভাবে মূলধন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। ফলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে শিল্প পণ্যের অধিকাংশ কাঁচামাল বাহির থেকে আমদানি করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। যা দেশের শিল্পায়নকে ব্যাহত করে।

৫. **শিল্পবান্ধব নীতির অনুপস্থিতির ও সরকারের অসহযোগিতা :** শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিল্পনীতির প্রবর্তন ও তার প্রয়োগ। সর্বশেষ শিল্পনীতি ২০১৫ প্রণয়ন হলেও এর সুফল পেতে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর পূর্বে কয়েক দফায় শিল্পনীতি প্রণয়ন হলেও শিল্পক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলো দূর হয়নি। অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে চাঁদাবাজি, শিল্প এলাকায় নিরাপত্তার অভাব ও শিল্পায়নে সরকারের অসহযোগিতা দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

উপর্যুক্ত বিষয়বালি ছাড়াও উদ্যোক্তার অভাব, দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব ও অনুন্নত অবকাঠামো শিল্পায়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ

সাধারণত কোনো রাষ্ট্র যে নীতির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বিদেশ নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি বলে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গত তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো হলো :

১. জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা।
২. জাতিসংঘ, EEC, EU, ASEAN, OPEC, OIC, GCC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।
৩. জোট নিরপেক্ষতা।
৪. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।
৫. অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর গুরুত্বারোপ।
৬. বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা।
৭. মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

'জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নির্ধারক'-ব্যাখ্যা

বিশ্বের সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সাধারণভাবে এক ও অভিন্ন। এ উদ্দেশ্যগুলো প্রধানত দেশসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার নিজস্ব অভিমত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন- এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণই যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নির্ধারক, তা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

➘ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য

১. **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা :** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং সমতা বজায় রাখা। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতের সাথে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ও তিনবিঘা করিডোর নিয়ে কূটনীতি এবং অবশেষে তার উল্লেখযোগ্য সমাধান ও উদ্দেশ্যকে আরো উজ্জল করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শান্তিকামী দেশ হিসেবে সব দেশের সাথেই বন্ধুত্ব কামনা করে, কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে না। যেসব দেশ অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে সেসব দেশকে বাংলাদেশ সমর্থন করে না কিংবা তার সাথে বন্ধুত্বও রাখে না।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুক্তি ব্যতিত কোনো দেশের ভূ-খণ্ডগত স্বাধীনতা অর্থহীন। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও এক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা অর্জন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, রুগ্ন শিল্প ও অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া মুক্ত অর্থনীতির যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিদেশি বাজার ধরা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ সব সময়ই নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (NIEO তথা New International Economic Order) সমর্থক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্লকে যোগদান ও Islamic Common Market গড়তে যেমন আন্তরিক, তেমনি ডি- ৮, দক্ষিণ এশিয়ায় SAPTA ও SAFTA বাস্তবায়ন, উন্নয়ন চতুর্ভুজ ও উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনেও বদ্ধপরিকর।

৩. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা :** পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্লকের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখে। দেশের প্রথম ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখলেও পরবর্তী সরকারগুলো পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। এমনকি ধর্মীয় আদর্শকে সমুন্নত রাখতে আরব দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক সুনিবিড়। এক্ষেত্রে মতাদর্শগত পার্থক্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

৪. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা :** শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তার পরিবেশ সৃষ্টি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যাশা করে বলে সব সময়ই অস্ত্র প্রতিযোগিতা, জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষ ও জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে। এ কারণে বাংলাদেশ ফিলিস্তিন ও মিয়ানমারে মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা জানায়। আবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ, পঞ্চশীলনীতি ও বান্দুং ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। অন্যদিকে নিজস্ব নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো, বিশেষত প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এ কারণে উপমহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে। কারণ এ অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক, বাংলাদেশ তা কোনোভাবেই চায় না।

৫. **জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখা :** বাংলাদেশের প্রধান পরিচয় হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। যে কোনো মূল্যে এ পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ একদিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, অন্যদিকে নিজস্ব স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া সর্বপ্রকার বর্ণবাদ, ইহুদিবাদ, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদ দূরীকরণ এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অপর একটি উদ্দেশ্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নির্ধারক।

অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় জাতিসংঘের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী দিয়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ৩১ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট ৮,৭৭২ জন শান্তিরক্ষী নিয়ে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে ছিল। এতে বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তেমনি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হচ্ছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের গুরুত্ব : জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের পথচলা ১৯৮৮ সাল থেকে। তবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কেবল নাম মাত্র ছিল। ১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশ থেকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্য নেয়া শুরু হয়। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী সামরিক সদস্য ও পুলিশের সংখ্যা ছিল ১০,৯৮৬ জন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়েছিল মোট ১৩,২৯৬ জন। এরপর ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬,৭৮২ জনে। এভাবে বর্তমানে মিশনে কর্মরত ৭,৯৬৭ জনসহ শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের ৭২ টি মিশনের মধ্যে ৬৩ টিতে ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্য অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে জাতিসংঘের স্ট্যান্ডার্ডে বেতন কাঠামো অনুযায়ী একজন শান্তিরক্ষী প্রতিমাসে ন্যূনতম ১০২৮ মার্কিন ডলার পায়। সেই সাথে রয়েছে বোনাস, অ্যালাউন্সসহ আরো নানাবিধ সুযোগ সুবিধা। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট ঘোষণা করে, যা বিশ্বের সাময়িক বাজেটের ০.৫ শতাংশেরও কম। জাতিসংঘের বাজেটের এই অপ্রতুলতা থাকার পরেও অনেক সময় বাজেট ঘোষিত অর্থায়ন নিশ্চিত করা যায় না।

তথাপি বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন থেকে আশানুরূপ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শান্তিরক্ষীর প্রতিজন সদস্য বেসিক ১,৩৩২ মার্কিন ডলারসহ প্রতিমাসে ১৫০০-১৮০০ মার্কিন ডলার আয় করছে। গড়ে প্রতি বছর ৮ হাজারের মতো সদস্য হিসেবে প্রতিবছর ১৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার থেকে ১৭ কোটি ২ লাখ মার্কিন ডলার আয় করে, যা বাংলাদেশি ১২০০ কোটি টাকার বেশি। এছাড়া অস্ত্রসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ব্যবহারের জন্য আরো অন্তত ৭০০ কোটি টাকা আয় করে। বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সূত্রানুযায়ী ২০১১ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশের আয় হয় ১ হাজার ১৯২ কোটি টাকা, যা ২০১২ সালে ছিল ২ হাজার ১৫৯ কোটি (প্রায়)। এরপর জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর ২ হাজার কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আসছে। যা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে এবং বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে BCIM-এর তাৎপর্য

BCIM-এর পরিচিতি : BCIM হলো বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমার এ চারটি দেশের একটি আঞ্চলিক সংস্থা। মূলত BCIM-হলো এশিয়ার এ চারটি দেশের মধ্যে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গঠিত একটি অর্থনৈতিক করিডোর। BCIM-এর ধারণাটি প্রবর্তন করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। যে উদ্যোগটি ১৯৯০ সালে একটি কাঠামো 'কুনমিং ইনেশিয়েটিভ' নামে পরিচিতি পায়। ১৯৯৯ সালে চীনের কুনমিং এ প্রথমবারের মতো এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ভারতের সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ (সিপিআর), চীনের ইউনাস একাডেমি অব সোসাল সাইন্স এবং মিয়ানমারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিত্ব করে। তারপর থেকে চার দেশের মধ্যে আলোচনা দরজা উন্মুক্ত হয়। ধারাবাহিকভাবে ২০১৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর দীর্ঘ আলোচনা শেষে চার দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা BCIM-EC নামে পরিচিত। যাতে সবাই সম্মতি জানায় যে, ভারতের কলকাতা, বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম, মিয়ানমারের মান্দালয় এবং চীনের কুনমিং পর্যন্ত করিডোরটি চালু থাকবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব : আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে BCIM-EC এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ অর্থনৈতিক করিডোরটি চালু হলে চার দেশের মধ্যে সংযোগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান এই চারটি দেশের জিডিপি বিশ্ব অর্থনীতির ১৭ শতাংশের বেশি দখল করে আছে। কিন্তু জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ফলে এই অঞ্চলের চার দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সংযোগ যেমন দরকার, তেমনি জনগণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও সংলাপ বাঞ্ছনীয়।

মূলত আন্তঃসংযোগ, বিনিয়োগ, ব্যবসা, জ্বালানি, পানি ব্যবস্থাপনা ও পর্যটন খাতকে প্রাধান্য দেয়া হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর সুবিধা ভোগ করবে সদস্য দেশগুলো। চীনের সাথে বাংলাদেশের বর্তমানে প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে অনেক দূরবর্তী পথ অতিক্রম করে চীনের বাণিজ্য করতে হয়। BCIM-EC কার্যকর হলে এই দূরত্ব অনেকাংশে কমে যাবে। অন্যদিকে চীনের অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে সাথে শ্রম মজুরি অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে সে দেশের অনেক শিল্প কারখানা সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশে সহজেই স্থানান্তরিত হবে। সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে চীনের। চীন এ করিডোরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে সহজেই প্রবেশ করতে পারবে। তবে কলকাতা থেকে কুনমিং পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ কিলোমিটারের এই করিডোরের রুট নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে একটু সমস্যা রয়ে গেছে। একটি রুট ভাবা হচ্ছে কলকাতা থেকে ঢাকা-সিলেট হয়ে আসামের শিলচর ও মণিপুরের ইম্পালাকে মিয়ানমারের মনিবার সাথে যুক্ত করে চীনের কুনমিং পর্যন্ত। অন্যটি ঢাকা-চট্টগ্রাম হয়ে ভারতের মিজোরামকে যুক্ত করে মিয়ানমারে সিত্তি বন্ধন পর্যন্ত পৌঁছা। তারপর মিয়ানমারের মান্দালায় হয়ে চীনের কুনমিং পর্যন্ত পৌঁছা।

শেষোক্ত রুটটিকেই কেন্দ্রীয় করিডোর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আর প্রথম রুটটিকে সাব করিডোর হিসেবে ভাবলেও সমস্যা মিটে যায়। কাজেই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার : শ্রমবাজার হলো একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যেখানে শ্রমের যোগানদাতা ও নিয়োগদাতা কাজে যোগ দিতে এবং কাজ প্রদানে সম্মত থাকে। এই বাজার দেশের অভ্যন্তরে, দেশের বাইরে সর্বত্রই হতে পারে। আন্তর্জাতিক বিবেচনায় যখন বিশ্বের মোট শ্রমশক্তি এবং এর চাহিদা ও যোগান চিন্তা করা হয় তখনই এটাকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বলা হয়। বিশ্বে বর্তমানে ৭০০ কোটির বেশি জনসংখ্যা থাকলেও শ্রমশক্তি রয়েছে ৩৩০ কোটি মতো। কর্মবিহীন মানুষ রয়েছে ২০ কোটির বেশি। বেকারত্বের হার ৫.৯%। তবে উত্তর আফ্রিকা, সাব-সাহারা অঞ্চল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বেকারত্বের হার তুলনামূলক বেশি। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যেমন উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে শ্রমের যোগান পাচ্ছে তেমনি উন্নয়নশীল দেশগুলোও উন্নত দেশসমূহ থেকে উন্নত শ্রমের যোগান পাচ্ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজার এখন উন্মুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে ঐ অঞ্চলের মোট জনসংখ্রার সমপরিমাণ শ্রমশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়োজিত রয়েছে। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, জাপানসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে উচ্চ প্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমের বাজার রয়েছে। অপরদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শ্রমঘন শিল্প অর্থাৎ স্বল্প দক্ষ শ্রমবাজারের প্রাচুর্যতা রয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা হলো ১৫ কোটি ৮৯ লাখ। অন্যদিকে শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী দেশে মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ ৬.১০ কোটি। এর মধ্যে ২৬ লাখ ছাড়া বাকি সকলেই কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তবে গুণগত বিবেচনায় এখানে অর্ধবেকারের সংখ্যা ২ কোটির উপরে। প্রতি বছর নতুন করে ২০ লাখ শ্রমশক্তি বাজারে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশের কৃষি খাত হলো শ্রমশক্তির প্রধান বাজার। মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। শিল্প খাতে রয়েছে ১৭ শতাংশ শ্রমিক এবং শ্রমশক্তির বাকি ৩৯ শতাংশ সেবা খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ : আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এ দেশের শ্রমশক্তি যোগানের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শ্রমশক্তি রয়েছে, যারা একদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখছে, অন্যদিকে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শ্রমশক্তির ১.৮৫ শতাংশ যোগান দেয়। ৬ কোটি জনশক্তি ভিন্ন সূত্রে ৮ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে ১ কোটির কমংস্থান বিদেশে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতেই ৭৫ শতাংশ শ্রমশক্তি রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরতে। বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের প্রধান উৎসও সৌদি আরব। সর্বশেষ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। যার মধ্যে সৌদি আরব থেকে ৪,০১৫.১৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি, যা বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করেছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে অর্থে বাংলাদেশ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) পূর্ব নাম ছিল GATT। এটি ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ১২ জানুয়ারি। বাংলাদেশ GATT-এর সদস্য হয় তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১ বছরের মধ্যেই তথা ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশ GATT-এর ৭৬তম সদস্য দেশ হলেও এর পরে আরো ৫২টি দেশ GATT-এ যোগ দেয়। ১৯৯৪ সালে মারাকেশ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় GATT-এর সদস্য ছিল ১২৮টি। অনেকেই ধারণা করেছিল ১৯৯৫ সালে WTO যাত্রার কয়ক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ এতে যোগ দিতে পারবে না। কেননা বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার তখন ছিল খুবই ছোট। মাথাপিছু আয় ছিল খুবই কম। বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান ছিল নগণ্য।

এ যুক্তিতে বাংলাদেশ WTO তে যোগ না দেয়ার সম্ভাব্য ১৪ টি দেশের একটি। কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক যাত্রার এবং শুরুতেই বাংলাদেশ এর সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ও অনেকের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বাংলাদেশ এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ LDC-ভুক্ত দেশ হলেও স্বল্প উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য রয়েছে, যা অনেক দেশের জিডিপি'র চেয়েও বেশি। পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে। বাংলাদেশ LDC-ভুক্ত দেশ হওয়ার সুবাধে বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত দেশেই শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করছে। আর WTO এর জোরালো নীতি বাস্তবায়নের ফলেই LDC-র উৎপত্তি। বাংলাদেশ বর্তমানে এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়েছে যে LDC-থেকে বের হয়ে আসলেও এর কোনো সমস্যা হবে না। WTO কর্তৃক মুক্ত বাণিজ্যনীতির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার তার বৃহৎ জনশক্তির কারণে বিশ্বে ৪৪তম এবং পিপিপির ভিত্তিতে ৩৩তম (আইএমএফ- ২০১৫)।

টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) দেশের প্রথম জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন করে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়াই এ কৌশল পত্রটির মূল লক্ষ্য। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। মোটকথা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিত বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার পরিবেশ অবিবেচ্য রেখেও পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ দুইয়ের যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আথ্য-সামাজিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় সেটাই 'টেকসই উন্নয়ন'। জাতিসংঘ পরিবেশের বিষয়ে মুখ্য অধিবক্তা এবং 'টেকসই উন্নয়ন'-এর নেতৃত্বস্থানীয় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছে। আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির সম্পর্কের বিষয়টি প্রথম উপস্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলনে (United Nations conference on the Human Environment)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে এ কমিশনের ১৯৮৭ সালের প্রতিবেদনেই উন্মুক্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিকল্প পথ হিসেবে টেকসই উন্নয়নের ধারণা উপস্থাপিত হয়। এ প্রতিবেদন বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন আহবান করে।

১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (United Nations Conference on Envirnment and Development- UNCED) বা ধরিত্রী সম্মেলনে (Earh Summit) অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ সম্মেলনে এজেন্ডা ২১ (Agenda 21) গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ ধরিত্রী সম্মেলন + ৫ (Earth Summit + 5)। এ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে সরকার প্রধানরা পুনরায় নিশ্চিত করেন। ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (World Summit on Sustainable Development-WSSD) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এজেন্ডা ২১-এ বর্ণিত টেকসই উন্নয়নের নীতি এবং অন্যান্য বিধিমালার বিষয়ে পুনরায় একমত হয়। ২০১২ সালের ২০-২২ জুন ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী বা রিও + ২০ সম্মেলনেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

শান্তির সংস্কৃতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ক্ষমতায়ন এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' শীর্ষক দুটি প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করার মধ্য দিয়ে 'শান্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নের' যে মডেল তুলে ধরেছিলেন, তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে। ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ অধিবেশনে ২৯ নম্বর এজেন্ডা হিসেবে প্রস্তাব দুটি সমর্থন করে। এরপর রেজ্যুলেশন আকারে তা পাস করা হয়। প্রস্তাব দুটির প্রথমটি 'জনগণের ক্ষমতায়ন' মডেল ২০১১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে তুলে ধরা হয় যা ঐ বছরের ২২ ডিসেম্বর 'জনগণের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন' শিরোনামে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাবটি আওয়ামী লীগ সরকারের আগের মেয়াদের শেষ দিকে ২০০১ সালে প্রথম উপস্থাপিত হয়। ২০০১ থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে আসছে এবং তা প্রতিবছরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে আসছে। ২০১২ সালের প্রস্তাবে 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রতিবছর আয়োজন করার বিধান রাখা হয়।

বাংলাদেশ-ভারত নৌ ট্রানজিট চুক্তি

নৌপথে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ক Protocol on Inland Water Transit and Trade চুক্তিটি নবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের সচিব পর্যায়ের বৈঠক ২০০৯ সালের ২৩ মার্চ ঢাকায় শুরু হয়। দু'দিনের এ বৈঠক শেষে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধন ছাড়াই চুক্তিটিতে নতুন করে স্বাক্ষর করেন উভয় দেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা। বিদ্যমান চুক্তিটির মেয়াদ ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এর নবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত ১১ বার চুক্তিটিকে নবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ওই বছরের ১ নভেম্বর চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন করা হলে সে চুক্তির ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিদ্যমান প্রটোকলটিও নবায়ন হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফরে এলে ১৯৮০ সালের পর আবারো বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। এর সূত্র ধরেই নবায়ন করা হয় নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ক প্রটোকলটি যা কার্যকর থাকে ২০১১ সাল পর্যন্ত। ২০১২ সালে এটার মেয়াদ ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়, যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। সাশেভ ২০১৫ সালে এ চুক্তির মেয়াদ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য আবারও বর্ধিত করা হয়েছে।

চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, মংলা, খুলনা ও সিরাজগঞ্জ নৌবন্দরে পোর্ট অব কল (বন্দর ব্যবহারের সুবিধা) সুবিধা পায় ভারত। একইভাবে ভারতের কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ ও পাণ্ডুতে পোর্ট অব কল সুবিধা পায় বাংলাদেশ। এছাড়া জলপথে পণ্য পরিবহনের এ প্রটোকল অনুসারে দু'দেশ আটটি রুটে একে অপরের পণ্যবাহী কার্গোকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে থাকে। এ আটটি রুট হলো-

০১. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-কাউখালি-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিতলমারী-ধুবড়ি-পাণ্ডু।

০২. একইভাবে পাণ্ডু-ধুবড়ি-চিলমারী থেকে চালনা হয়ে হলদির-কলকাতা।

০৩. কলকাতা - হলদিয়া - রায়মঙ্গল - মংলা - কাউখালি - বরিশাল - হিজলা - চাঁদপুর - নারায়ণগঞ্জ - ভৈরববাজার - আজমিরীগঞ্জ - মারকুলি - শেরপুর ফেঞ্চুগঞ্জ - জকিগঞ্জ - করিমগঞ্জ।

০৪. একইভাবে করিমগঞ্জ থেকে কলকতা।

০৫. রাজশাহী-গোদাগাড়ী-ধুলিয়া।

০৬. ধুলিয়া-গোদাগাড়ী-রাজশাহী।

০৭. করিমগঞ্জ - জকিগঞ্জ - ফেঞ্চুগঞ্জ-আজমিরিগঞ্জ-ভৈরববাজার-নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধুবড়ি-পাণ্ডু।

০৮. একইভাবে পাণ্ডু থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে করিমগঞ্জ।